নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ৩

সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদক

হাসান শরীফ আহমেদ

সম্পাদনা পরিষদ

সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, সাদিয়া এ চৌধুরী
কানিজ ফাতেমা ও মু. গোলাম সাত্তার

ব্র্যাক

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

প্রকাশক : গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১২১২

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১২১২

১৯৯৩-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ২২টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

Nirjash: **Summary of selected RED research reports of 1993. Number 3, September 1996. Published by the Research and Evaluation Division, BRAC, 66 Mohakhali C/A, Dhaka 1212, Bangladesh.**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সুরুচি রেঁস্তোরার ব্যবস্থাপনা: মহিলাদের একটি
ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস ১

শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ৫

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর একটি জরিপ ৯

দরিদ্রদের আইনি জ্ঞান: নির্বাচিত বেসলাইন তথ্য ১২

ব্র্যাকের রেশম চাষ প্রকল্প: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ ১৭

বাংলাদেশে জমির মালিকানা এবং ভোগ দখলের ধরন: একটি গ্রাম সমীক্ষা ২২

মানিকগঞ্জের গিলন্ডা গ্রামে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব ২৫

মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব ২৮

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন দক্ষতার জ্ঞানের উপর কয়েকটি বাছাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব: একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ ৩১

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে দেয়? ৩৪

স্বাস্থ্য বিষয়ক

গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের উপর একটি মূল্যায়ন ৩৬

গর্ভবতী মহিলাদের সেবা প্রদানে ব্র্যাকের ভূমিকা ৩৮

সন্তান প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ৪০

গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা ৪৬

স্বাস্থ্য ও মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন নির্ণয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি: একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ৪৯

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি: প্রতিদ্বন্দ্বিতা না সহযোগিতা? ৫৫

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি ও দারিদ্র্য ৫৯

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব ৬১

দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিম্ন পর্যায়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগকে বেছে নেয়াই কি উত্তম? ৬৬

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন ৬৯

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কী এ কর্মসূচির কাজকে বোঝা মনে করে? ৭৩

সরকারি কর্মী, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব ৭৬

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের সাথে গবেষণার সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই ব্র্যাক কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে গবেষণাকে কাজে লাগানোর জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ গড়ে তোলা হয়। এ বিভাগ এ পর্যন্ত চার শতেরও বেশি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রায় সকল গবেষণাই ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর পরিচালিত হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে ব্র্যাকের সকল কর্মকাণ্ডের উপর বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবু ব্র্যাকের প্রধান কয়েকটি কার্যক্রমের উপর সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

ব্র্যাকের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচন ও দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্য সাধনে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয় কর্মসূচি ১৯৮৬ সাল থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও ১৯৭৬ সাল থেকেই মানিজগঞ্জে, এবং তারও আগে সিলেটের শাল্লায়, সমন্বিত প্রকল্পের আওতায় পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পল্লীর দরিদ্র জনসাধারণকে সংগঠিত করে তাদের সচেতন কর তোলা, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা, দুস্থ মহিলাদের আর্থিক সাহায্য করা, প্রয়োজনীয় আইন জ্ঞান দিয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য দিক বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্র্যাক রিপোর্ট ১৯৯৫ দ্রষ্টব্য।

বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে যারা কখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি বা হলেও লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে পারেনি তাদের জন্য ১৯৮৫ সালে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ৮-১০ বছর বয়সী শিশুদের ৩ বছর মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের ৩ বছর মেয়াদী মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে ২২,১৬০টি গ্রামের ৩৫,১৭৫ স্কুলে শিক্ষার্থীর সখ্যা ছিল ১১,৩৭,৭৬৭ জন (৭০% মেয়ে)। শিক্ষক ছিলেন ৩৩,৫২৪ জন যার ৯৬% মহিলা। এ কর্মসূচির সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ ধরনের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল চালুর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ইউনিসেফের উদ্যোগে ব্র্যাক পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে এ ব্যাপার পরামর্শ দান ও সহযোগীতা করার জন্য নাইরোবীতে ১৯৯৪ সালে কাজ শুরু করে।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য খাতেও ব্র্যাক পিছিয়ে নেই। দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষ করে মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য ১৯৯১ সালে ব্র্যাক মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি নামে এ কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৯৫ সাল নাগাদ ১২,০৫৬টি গ্রামের ১ কোটি ৩৮ লক্ষ লোক এ কর্মসূচির আওতাধীন ছিল। গর্ভবতী মহিলাদের ৮৯৮টি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, সরকারের পরিবার পরিকল্পনা, কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান, প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি এ কর্মসূচির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক।

একজন কর্মীর দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। এ উপলব্ধি থেকে ব্র্যাক ১৯৭৮ সালে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেয়। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নমানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশের লক্ষ্যে ব্র্যাক, জিম্বাবুইয়ের ORAP ও যুক্তরাষ্ট্রের School for International Training (SIT) যৌথভাবে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৭৫ সাল থেকে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গবেষণা সহায়তা দিয়ে আসছে। ব্র্যাকের গবেষণা রিপোর্টসমূহ ব্র্যাক ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উনয়ন সংস্থা, গবেষক ও বিশেজ্ঞগণ কাজে লাগাচ্ছেন। ব্র্যাকের মাঠপর্যায়ের কর্মীগণও যাতে গবেষণার ফলাফল জানতে পারেন সে জন্যই গবেষণা রিপোর্টের সারমর্ম বালায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে ব্রঅকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ যতগুলা গবেষণা সম্পন্ন করেছে তা থেকে নির্বাচিত ২২টি গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ এ খণ্ডে প্রকাশিত হল। এ কল প্রতিবেদনের দেয়া ব্র্যাক সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান ১৯৯৩ সালের। সামপ্রতিক পরিৎসংখ্যান পরিশিকষ্ট ১০এ দেয়া হল।

ইচ্ছা ছিল নির্যাসের তৃতীয় খণ্ড আরো আগে আপনাদের হাতে তুলে দেবার। বিলম্বের বিভিন্ন কারণগুলোর মধ্যে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যতম। আরো আগে প্রকাশের জন্য আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার দৈন্যতা আমাদের ছিল না।

নির্যাস প্রকাশের পর থেকেই আপনাদের অনেক সুপারিশ, পরামকর্শ, মূল্যাবান মতামত ও প্রশংসা আমাদের কাছে এসেছে যা পরবর্তী প্রকাশনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক পর্যালোচনায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, নির্যাস পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত মাঠকর্মীদের জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ব্র্যাকের কর্মীদের কাছ থেকে জানা গেছে, তারা অনেক অজনা বিষয় নির্যাসের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন এবং প্রশংসা করেছেন নির্যাসের সার্বিক দিকের। মূলতঃ ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মী তথা জনসাধারণের কাছে গবেষণা প্রতিবেদনের মূল তথ্যের কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার জন্যই এ প্রয়াস। ইংরেজীতে লেখা এই প্রতিবেদনগুলিকে বোধগম্যতা বজায় রেখে এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যাতে এই প্রতিবেদন পড়তে গিয়ে কোন পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে।

ব্র্যাক ও ব্রাকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর নির্যাস-এ খুঁজে পাবেন এ আমাদের বিশ্বাস। নির্যাস-এর মাধ্যম আপনারা উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শের সংযোজনে আরো সমৃদ্ধ করে কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে নির্যাস আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব-এ আমাদের প্রত্যাশা। সবশেষে, যে সব প্রতিষ্ঠান, সংগঠন কিংবা ব্যক্তি বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে নির্যাস সমৃদ্ধতর করতে সাহায্য করেছেন তাদের জানাই ধন্যবাদ।

নির্যাস সম্পর্কে আপনাদের মতামতকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

'সুরুচি রেস্তোরাঁর' ব্যবস্থাপনা ঃ মহিলাদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস[1]

মাহমুদা রহমান খান

আমাদের দেশের ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়না, অন্যদিকে তেমনি মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত কাজসমূহেরও অর্থনৈতিক মূল্য দেয়া হয় না। ব্র্যাক সামাজিকভাবে অবহেলিত মহিলাদের সনাতন ধ্যান-ধারণার বাইরে অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে রুরাল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট বা গ্রামীণ উদ্যোগ প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত 'সুরচি রেস্তোরাঁ' চালু করা হয় এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি খাতের বাইরে গ্রামীণ মহিলাদের মধ্য থেকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। যাতে মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারে এবং পুঁজি, নগদ অর্থ আর বজার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তারা নিজেদের আয়ের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। গ্রামের দুঃস্থ মহিলারা দীর্ঘ দিনের কুসংস্কার ভেঙে উদ্যোক্তর ভূমিকায় এগিয়ে আসতে পারে।

ব্র্যাকের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উদ্যোগের আওতায় ১৯৯০ সালে ব্র্যাক ৪ জন মহিলা নিয়ে মানিকগঞ্জের ঘিওরে একটি রেস্তোরাঁ খোলে। সেখানে মহিলারা মজুরী ভিত্তিক কাজ করতো। কিন্তু দেখা গেল, এটিকে তারা কখনই নিজেদের ব্যবসা বলে মনে করতে পারেনি। ফলে রেস্তোরাঁটিতে লোকসান হল এবং এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। এরপর ১৯৯১ সালে মেয়েদের একক মালিকানায় খোলা হলো সুরুচি রেস্তোরাঁ। এজন্য ঋণ দেয়া হলো ৬,৫০০ টাকা। ঋণ দেয়ার সময় তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, সামান্য ব্যবসায়িক জ্ঞান আছে এমন মহিলা, এবং যাদের বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি গৃহীত হয়।

সুরুচি প্রকল্প শুরু করার দেড় থেকে দু'বছরের মধ্যে এ গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়। অর্থাৎ একটি নতুন প্রকল্প তখনও বাস্তবে ততটা বেড়ে উঠতে পারেনি। ফলে পরিপূর্ণতার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। ইতিমধ্যে সুরুচি সম্পর্কে কিছু নীতিগত পরিবর্তনও করা হয়েছে।

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সারাদেশে ২৭৩টি সুরুচি রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুরুচি রেস্তোরাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সে লক্ষ্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য মানিকগঞ্জ, জামালপুর ও শেরপুর জেলার ৬টি সুরুচি রেস্তোরাঁর উপর একটি গবেষণা করা হয়েছে। এসব রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠার সময় ধারণা করা হয়েছিল যে, এক বছরের মধ্যে যে লাভ হবে পরবর্তী বছরের পুঁজি হিসাবে তা বিনিয়োগে করা হবে। ব্র্যাকের ঋণের আর দরকার হবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, অনেকেই নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেনা। সে জন্য এটাও দেখা দরকার হয়ে পড়লো যে, রেস্তোরাঁগুলো কেমন লাভ করছে, কিভাবে খরচ করছে এবং আদৌ মহিলা উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে কিনা।

---

[1] Summary of the RED researh report entitled "Women's entrepreneurship in the restaurant business: case of Suruchi" by Mahmuda R Khan, 1993 April, 56p. (Summarized in Bangla by Shahana Huda)

এ গবেষণায় কল্পনা, ময়না, হাওয়া, আকলিমা, খোদেজা ও মাজেদার হোটেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে মাজেদার হোটেলকে আলোচনা বাইরে রাখ হয়েছে। কারণ এর মালিকানা বদল হয়েছে, এটা বর্তমানে পুরুষ চালিত এবং বর্তমান মালিক ব্র্যাকের সদস্য নয়। বাকিদের মধ্যে কল্পনা তার স্বামীর সহযোগিতা নিয়ে রেস্তোরাঁ ব্যবসা চালায়। ময়না তালাকপ্রাপ্তা, সে নেয় তার ছেলের সাহায্য। হাওয়া তার ব্যবসার ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে বোনের উপর নির্ভরশীল। আকলিমা ও খোদেজা স্বামীর উপর নির্ভর করে রেস্তারাঁ চালায়। প্রত্যেকেই ব্যবসাটিকে একটি পারিবারিক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করেছে, অর্থাৎ পরিবারের সবাই এই ব্যবসায় জড়িত। ব্যাকের কাছ থেকে মেয়েদের নামে ঋণ নেয়া হলেও মূলত টাকা পয়সার নিয়ন্ত্রণ থাকে পুরুষদের হাতে। প্রতিটি সুরুচি রেস্তোরাঁই বাসস্ট্যাণ্ড বা বাজারে অবস্থিত। মেয়েরা সাধারণতঃ রান্না ও ধোয়া মোছার কাজটি করে। পুরুষরা খাবার পরিবেশন, বাজার ও টাকা পয়সার হিসাবে কাজটি করে। অর্থাৎ মেয়েরা তাদের জন্য নির্ধারিত সনাতন কাজটি করছে সকাল থেকে রাত অব্দি। কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তারা গ্রহণ করেনি। তবে এই ৫ জনের মধ্যে ময়না খানিকটা ব্যতিক্রম। সে বাজার করে ও ব্যবসার নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে রেখেছে। কল্পনা যদিও সুরুচির জন্য স্বামীর উপর নির্ভর করে কিন্তু সে লাভক্ষতি, ব্যবসা, ইত্যাদি বোঝে। সুরুচির বাইরেও সে নানা ধরনের ব্যবসার চেষ্টা করেছে। হাওয়া এবং তার বোন জোহরা দু'জনে পুরুষদের সাহায্য ছাড়াই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সবাই মোটামুটি স্বাচ্ছন্দে এলাকাবাসীর কোন সমালোচনা ছাড়াই ব্যবসা করছে।

তবে খদ্দেররা কেউ এই রেস্তোরাঁগুলোকে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত রেস্তোরাঁ বলে মনে করে না। কারণ তারা মেয়েদের কখনো পরিবেশন করতে বা ক্যাশে বসে থাকতে দেখেনি। তারা খেতে আসে এজন্য যে, রেস্তোরাঁগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও যারা খাবার পরিবেশন করে তাদের ব্যবহার ভাল।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুরুচি রেস্তোরাঁগুলোর মাধ্যমে আমাদের গ্রামীণ মহিলাদর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। রেস্তোরাঁয় কাজ করলেও সংসারে রানা বান্না করাই তাদর প্রধান দায়িত্ব থেকে যায়। উপরন্তু এ কাজে তাদের অনেক বেশি সময় দিতে হয়। একজন মহিলার পক্ষে সকাল ৬/৭ টা থেকে রাত ১০/১২টা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকা খুবই কষ্টকর, বিশেষ করে রাতের বেলা। তখন তাদের স্বামীর সাথে কাজ ভাগ করে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে ব্র্যাকের নীতি অনুসারে স্বামী শুধু কর্মী হিসাবে স্ত্রীর হোটেলে কাজ করবে, এটা ভাবা অবান্তর। স্বামী বা ছেলে যখন হোটেলের অংশীদারিত্বে চলে আসে, তখন তাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে দেখা গেছে। বিশেষ করে যাদের স্বামী সুরুচির সাথে জড়িত তারা এটাকে নিজেদের ব্যবসা বলে মনেই করে না। একদিন যে এই ব্যবসাকে তারা দাড় করাবে এরকম আত্মবিশ্বাসেরও অভাব রয়েছে। তাদের কথা থেকে বোঝা গেছে, ব্র্যাকের ঋণ শোধ হলে তারা এই ব্যবসা থেকে নিজেদের গুটিয়ে ফেলবে।

এ সকল হোটেলের মালিকরা যেভাবে খরচের হিসাব-নিকাশ করে, তাতে প্রকৃত খরচ বের হয়ে আসে না। দেখা গেছে, তাদের ব্যবসায় লাভ হয় মাসিক ১,২৭২ টাকা থেকে ৯,৭৬৭ টাকা পর্যন্ত। অথচ ঐ ছোট ব্যবসায়ে যে টাকা বিনিয়োগ করা হয় তাতে এতো লাভ অসম্ভব। উপরোক্ত ৫ জনের মধ্যে একমাত্র ময়না ছাড়া বাকিরা কর্মীদের বেতন ও খরচের হিসাব করে না। উদ্যোক্তাদের পরিবারের সব সদস্যই প্রতিদিন রেস্তোরাঁয় খায়, যার খরচ প্রায় ৫০ টাকা। কিন্তু হিসাবে তার উল্লেখ করে না। অন্যদিকে যারা রেস্তোরাঁয় কাজ করছে তাদের শ্রমের বাজার মূল্য যদি নির্ধারণ করা হয়, তাহলে লাভ কিছুই থাকেনা। খুবই খাপছাড়াভাবে তারা জমা-খরচের হিসাব গণনা করে। এক্ষেত্রেও মাসিক হিসাব তারা বের করতে

পারে না। প্রত্যেকেই দেখিয়েছে যে, তারা প্রতিদিনকার আয় পরবর্তী দিনের পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করে। কিন্তু কিভাবে করে এটা উলেøখ করে না।

যদিও ব্র্যাক মহিলাদের ঘরের বাইরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে সফল হয়েছে, কিন্তু এতে তাদের সামাজিক অবস্থানে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। যতদিন মহিলাদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হবে, ততদিন মহিলাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে না। নারী-পুরুষগত এ বৈষম্য দূর করতে ব্র্যাক কেবলমাত্র মহিলাদের নিয়েই কাজ করেছে। কিন্তু পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য তেমন একটা কাজ করেনি। যদি নারী-পুরুষের এ বৈষম্য সত্যিই দূর করতে হয়, তাহলে নারী ও পুরুষ উভয়ের দিকেই নজর দিতে হবে।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণাধীন ছয়টি রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সনাতনী কর্ম বিভাজন এখনো কাজ করছে। অর্থাৎ মেয়েরা উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্রে না গিয়ে বরং রেস্তোরাঁর চার দেয়ালের মাঝেই আবদ্ধ রয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্যকে এই ধরনের প্রকল্প চ্যালেঞ্জ করছে না। সবশেষে যদি আমরা দেখি যে, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে মহিলাদের কাজে পরিবেশ কতটা সহায়ক ছিল সেক্ষেত্রেও নিরুৎসাহিতই হতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা তাদের স্বামীর সাহায্য ছাড়া রেস্তোরাঁ চালাতে অক্ষম। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা বাইরের কাজ যেমন, বাজার করা, ইত্যাদি করতে পারছে না। এর ফলে এ প্রকল্প মহিলাদের উদ্যোক্তা হওয়ার স্পৃহাকে বাড়াতে পারছে না। এমন কি সমাজর প্রথাগত নারী-পুরুষ বিভাজনকেও চ্যালেঞ্জ করছে না।

হাওয়ার সমাজের মধ্যবিত্তরা মনে করে গরীবদেরই সাজে এ ধরনের কাজ করা। মধ্যবিত্ত মহিলাদের পক্ষে ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা উচিত নয়।

কল্পনার সমাজের লোকজনও মনে করছে কল্পনা যা করছে তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। কারণ সে এ কাজ আগেও করেছে। তবে ব্র্যাকের ঋণ পেয়ে তাদের অনে সবিধা হয়েছে। তা ছাড়া সমাজে তার সম্মানও বেড়েছে।

আমাদের সমাজে পর্দা প্রথার একটা উদ্দেশ্য হলো মহিলাদের গৃহকর্মে নিয়োজিত রাখা। গৃহের বাইরের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকার বা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার বিষয়টা অনেকটা আপেক্ষিক। তা ছাড়া এতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সমম্পর্কেও সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। কারণ, গরীবদের ক্ষেত্রে পর্দা প্রথা অনেকটা শিথিল থাকে। যারা ব্র্যাকের সদস্য নয়, তাদের মতে, গরীব মহিলাদের জন্য রাস্তায় ভিক্ষা করার চাইতে একটা দোকান নিয়ে ব্যবসা করা অনেক ভাল।

একজন উদ্যোক্তার কিছু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার, যেমন লাভ-লোকসানের ধারণা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি। তাছাড়া বাচারে যাবার ক্ষমতা থাকতে হবে তার। সুরুচি রেস্তোরাঁর মালিক মহিলাদের ক্ষেত্র স্বাবলম্বী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা এখনো তেমনটা দেখা যায়না। যদিও কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের বেশ ব্যবসায়িক বুদ্ধি রয়েছে, ব্যবসার অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে তারা এবং বাজারেও তাদের যাতায়াত রয়েছে।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মহিলারা ব্যবসার কিছুই বোঝে না। হয় স্বামী, নয় অন্য কারো উপর তারা নির্ভরশীল।

ব্র্যাক মনে করে, প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের কিছুটা সহায়তা দরকার। পরবর্তীতে তারা স্বাবলম্বী হবে। কিন্তু প্রথম থেকেই এ পরনির্ভরশীলতা তাদের স্বাবলম্বী হবার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্র্যাক যদি মহিলাদের সাংগঠনিক গুণের বিকাশ ঘটাতে চায়, সেক্ষেত্রে স্বামীর উপর নির্ভর না করে বরং প্রথম থেকেই যাতে নিজেদের চেষ্টায় ব্যবসা শুরু করতে পারে, সে দিকে নজর দিতে হবে। মহিলাদের বাছাই করার সময় ব্র্যাক তাদেরই অগ্রাধিকার দেয় যাদের স্বামীদের বাজারে ইতিমধ্যেই দোকান আছে। এতে শুরুতেই তারা স্বামী নির্ভর হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বলা হয়, স্বামীরা ব্যবসার আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে পারবে না এবং তারা দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় এ ধরনের চিন্তা ভাবনা বাতুলতা মাত্র।

এ ছাড়াও ব্র্যাক যদি রেস্তোরাঁয় মহিলাদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য দলিল-দস্তাবেজের উপর গুরুত্ব দেয়, তাহলে দেশের সকল জায়গাতেই এ ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বামী রেস্তোরাঁর মালিকানা স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করে কেবল মাত্র ঋণ পাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাত সত্যিকার অর্থে মহিলারা ব্যবসার মালিক হচ্ছে না। ঋণের টাকা শোধ হবার পর মালিকানা আবার স্বামীর কাছেই ফেরৎ যায়।

তাছাড়া, ভবিষ্যতে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। ঋণ দেবার ক্ষেত্রে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পৃথক ব্যবসা করছে এমন মহিলাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ, ব্যবসাতে স্বামী জড়িত থাকলে মহিলাদের স্থান হয় সেই সনাতনী কর্মক্ষেত্রেই। এতে নারী-পুরুষ ভিত্তিক শ্রমের বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হয়না। আর যদি তা না হয়, তাহল মহিলা উদ্যোক্তাদেরও কোন বিকাশ ঘটবে না।

শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনের ভূমিকা[২]

নাভিদা আহমেদ খান

উৎপাদন শিল্পে মহিলাদের নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৮৩ সালে মানিকগঞ্জে আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে ফাউণ্ডেশনের কাজের পরিধির অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে। বর্তমানে (১৯৯৩) মানিকগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও যশোরের চারটি কেন্দ্রের ১১০টি উপকেন্দ্রে ৫ হাজারেরও অধিক মহিলা উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন বুনন, সেলাই ও কাপড় ছাপার কাজ। সূচনালগ্ন থেকেই এ ফাউণ্ডেশন মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তি নামে একটি ফেডারেশনের মাধ্যমে এর উৎপাদন কার্যাবলী পরিচালনা করে আসছে। যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে গ্রামীণ মহিলাদেরকে উৎপাদনের নিয়োজিত করে দারিদ্র বিমোচন করা, ফেডারেশনকে ঋণ দেয়া, শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেডারেশনকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া, ইত্যাদি অন্যতম। দেখা গেছে, ১৯৮৫ সালে ফাউণ্ডেশনের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় ছিল ২২ লাখ টাকা, কিন্তু ১৯৯১ সালে তা ৪ কোটি ১৩ লাখ টাকায় দাড়ায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করাই এই ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য। কিন্তু দেখা গেছে, এই ফাউণ্ডেশন মহিলাদের জন্য চাকুরীর বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করলেও নেতৃত্ব কিংবা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছেনা। গ্রামীণ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকে মহিলারা কিভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে এবং শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়শা আবেদ ফাউণ্ডেশনের পরিবেশ কতটুকু উপযোগী তা দেখাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণার জন্য মূলতঃ ব্র্যাকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত মহিলাদর উপর পরিচালিত সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। মানিকগঞ্জ ও জামালপুরের আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশন ও আড়ং-এর মহাব্যবস্থাপকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও সংশিষ্ট কর্মসূচি সংগঠকদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং ফাউণ্ডেশনের উপকেন্দ্রের কতিপয় নির্বাচিত মহিলা যেমন, উপকেন্দ্রের ইনচার্জ ও শাখা প্রধানদের সাথে খোলামেলা ও অন্তরঙ্গ আলোচনা করা হয়।

---

[2] Summary of the RED research report entitled "Development of entrepreneurship in Ayesha Abed Foundation, Manikganj: a brief analysis" by Naveeda Ahmed Khan 1993 March 21p, (Summarized in Bangla by AKM Ahsan Ullah)

আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনের শিল্পোদ্যোগ

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক এই ফাউণ্ডশনের প্রধান। ফাউণ্ডেশনের প্রতিটি কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক। তিনি ব্র্যাকের বিক্রয় কেন্দ্র আড়ং থেকে অর্ডার সংগ্রহ করেন। যাবতীয় উৎপাদন, বিতরণ, পরিবহণ, বেতন ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকেন। মানিকগঞ্জের আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনে বুনন, সেলাই, ছাপা, ব্লক ছাড়া, এমব্রোয়ডারী, ধোলাই, সেলাই, ইস্ত্রি ও উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন হয়। শাখা প্রধান কাঁচামালের অর্ডার সংগ্রহ, দৈনিক উৎপান, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ, ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকেন। এ ফাউণ্ডেশনের কর্মরত সকল মহিলাই মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তির সদস্যা। ফেডারেশনের সদস্যগণ নিজেদেরকে ব্র্যাকে উন্নয়নের অংশীদার মনে করে। বর্তমানে (১৯৯৩) এই ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ২,০০০। ফাউণ্ডেশনের মহিলাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্র্যাক তার পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আরডিপি) মাধ্যম ফেডারেশনকে ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। লাভের শতকরা ১৬ টাকা এ সমিতি ফাউণ্ডেশনের ঋণ পরিশোধের জন্য দেয়। আরো শতকরা ৫ টাকা দেয় সংস্থাপন ও ব্যবস্থাপনার জন্য। ফেডারেশনের প্রত্যেক সদস্যাকে লাভের বাকী অংশ থেকে ২০০ টাকা করে ঈদ বোনাস প্রাদন করা হয়। লাভের অংশের এ সমস্ত দেনা-পাওনার পর যা থাকে তা ফাউণ্ডেশন আবার বিনিয়োগ করে। ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে গেলে ফেডারেশন ঐ নির্ধারিত শিল্পের মালিক হয়ে যায়।

১৯৮৬ সালে জামালপুরে আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে ১৯৭৬ সাল থেকে মহিলারা জামালপুর মহিলা কর্মসূচিভুক্ত ছিল। এর সূচনালগ্ন থেকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ নকশী কাঁথা আড়ং এ সরবরাহ দেয়া হত। পরে মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তির মত জামালপুর মহিলা শ্রমজীবী দল গঠিত হয়। জামালপুর মহিলা শ্রমজীবী দল মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তির চেয়ে কম ঋণ পেত এবং তা অতিদ্রুত পরিশোধ করে তারা আগেই মালিক হয়ে যেত। এ উদ্যোগ গ্রাম্য শ্রমজীবী মহিলাদেকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে। ফলে পরস্পরের মাঝে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং একাত্মবোধ, সংহতিবোধ ও নেতৃত্বের গুণাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলাফল

সাংগঠনিক পর্যায়ে আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনের যৌথ শিল্পোদ্যোগে সফলতা এসেছে। আরডিপি'র দল দঠন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি হয। ব্র্যাকের আরডিপি'র সাথে ফাউণ্ডেশন সমন্বয় ঘটিয়েছে। এবং ফাউণ্ডেশনের মহিলাদেরকে সমিতির সাপ্তাহিক সভায় যোগদানের সুযোগ করে দিয়েছে।

দেখা গেছে, মহিলারা উৎদাদিত দ্রব্যের মান সম্পর্কে খুবই সচেতন। দ্রব্যাদির বিভিন্ন ডিজাইন ও গুণগত মান সম্পর্কে জানার জন্য কিছু কিছু মহিলা ঢাকার আড়ং-এ আসার উদ্যোগ নেয়। আড়ং-এর মহাব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, যে, গুণগত কারণে দ্রব্যাদি বাতিল হওয়ার হার শতকরা ২৩ ভাগেরও কমে এসে দাড়িয়েছে। প্রথমাবস্থায় এই হার ছিল শতকরা ১৫ ভাগ। তিনি আরো জানান, তৈরীকৃত দ্রব্য মহিলারা অতিদ্রুত পাঠাতে পারে। তারা সঠিক সময়ে দ্রব্য উৎপাদন করে সঠিক সময় সরবরাহ দিতে পারে। কোন কারণে সঠিক সময়ে দ্রব্যের ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হলে তারা তা অতিদ্রুত কেন্দ্রের

ব্যবস্থাপককে জানিয়ে দেয়। মানিকগঞ্জ থেকে দ্রব্য আনার জন্য ব্র্যাক সপ্তাহে দু'বার গাড়ি পাঠায়। কিন্তু জামালপুর ফাউণ্ডেশনের উৎপাদিত দ্রব্যাদি ঢাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা ওখানকার মহিলাদেরকেই করতে হয়। দেখা গেছে, মহিলাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ববোধ বিলম্বে সৃষ্ঠি হয়। এছাড়া তাদের মধ্যে যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

অনেক মহিলাকে মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি, কিন্তু গ্রাম সমিতি সম্পর্কেই ভাল জানে। তাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা কিংবা পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা তাদের ব্যক্তিগত কথাই আগে বলেছে। কতিপয় মহিলা জানিয়েছে যে, তারা শুনেছে আরডিপি মানিকগহঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তিতে বিনিয়োগ করা জন্য মহিলাদেরকে এ হাজার থেকে দু'হাজার টাকা ঋণ দেয়। কিন্তু তারা ব্যক্তিগত ঋণের ভার বাড়াতে চায়নি বলে এ ঋণ নেয়নি।

পূর্বে যখন ফাউণ্ডেশন আর ফেডারেশনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হত তখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপকই সকল সদস্যদেরকে ডেকে আলোচনা শুরু করতেন। অধিকাংশ সভাতেই তাদের সমস্যা ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু এই সভা বন্ধ হয়ে গেলে ঋণ পরিশোধ কিংবা গ্রহণ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার পথও তাদের বন্ধ হয়ে যায়। যা অনেকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, জামালপুর শ্রমজীবী মহিলা দলের সাংগঠনিক সচেতনতা বেশি। দু'বছর অন্তর তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে (১৯৯৩) কার্যরত কমিটি ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচিত হয়েছে। প্রতি ২ মাস অন্তর এ কমিটি সভায় বসে। প্রথম সভায় তারা তাদের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও সাতজন নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত করে। মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তি ও জামালপুর শ্রমজীবী মহিলা দল আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করে। হিসাব শাখা ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপকদের সাথে নতুন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণী বিষয় নিয়ে মহিলাদের আলোচনা করার নিয়ম নেই। কিন্তু উৎপানকারী মহিলাদের কেন্দ্র ব্যবস্থাপকদের কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করার সুযোগ আছে। দেখা গেছে, ফাউণ্ডেশন মহিলাদের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। সুষ্ঠু যোগাযোগ নিশ্চিত করে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করে ফাউণ্ডেশন স্বতন্ত্র উৎপাদন ইউনিট গড়ে তুলতে চাচ্ছে।

আলোচনা

এ সমীক্ষায় মূলতঃ আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশন কতটুকু দক্ষতার সাথে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সেটাই দেখা হয়েছে। এই ফাউণ্ডেশনে নিয়োজিত মহিলারা তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দেখা গেছে, আর্থিক লেনদেন ঠিকমত হচ্ছে, কর্মীদের সময়মত বেতন প্রদান, ঢাকা থেকে অর্ডার সংগ্রহ ও তার সুষম বন্টন ইত্যাদি সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। পরে ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন শাখা থেকে আগত সকল দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তি দু'জন মহিলাকে ঢাকায় নিয়োগ দিয়েছে। দেখা গেছে, মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে এ উদ্যোগ তেমন সার্থক হয়নি। পর্দা প্রথা মহিলাদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। দেখা

যায়, শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি কিংবা নেতৃত্ব সৃষ্টিতে এ সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নেতৃত্ব সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকলেও এ দ্বারা সার্বিক অবস্থা বোঝা কঠিন।

মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তি, নবগ্রাম উপকেন্দ্রের সেক্রেটারী সুফিয়া তুলনামূলকভাবে ধনী। তাদের দু'টি রাইছ মলি ও মাছ চাষ প্রকল্প রয়েছে। স্বামীর এক একর জমি রয়েছে। তার স্বামী প্রতি মাসে দু'হাজার টাকা আয় করে। সুফিয়া নিজেও উপকেন্দ্রের দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে কাজ করে মাসে ১,২০০ টাকা আয় করে। তার বাচ্চার দেখা শোনার জন্য একজন গৃহভৃত্যও সে রেখেছে।

সুপাশিমালা

- ব্যবস্থাপনা, ট্রাষ্টি ও আড়ং কর্মকর্তাদের নিয়ে ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য, অঙ্গীকার, ক্ষমতায়নের কৌশল ইত্যাদি বিষয় পুনমূল্যায়নের জন্য সভা বসতে পারে।

- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর ফাউণ্ডেশনের প্রভাব লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

- যৌথ শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা শক্তি ও জামালপুর শ্রমজীবী মহিলা দলের জবাবদিহিতা, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও নির্বাচন পদ্ধতির দিক নির্দেশনা সম্বলিত একট সংবিধান তৈরি করা যেতে পারে।

- পারিশ্রমিক, স্বাস্থ্য সুবিধাদি, অধিকার, ও বিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীদর সুসম্পর্কের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর একটি জরিপ[৩]

টি কে বড়ুয়া, সমীর রঞ্জন নাথ ও সারোয়ার জাহান

বাংলাদেশের এ পর্যন্ত যতগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে 'যমুনা বহুমুখী সেতু' অন্যতম। প্রস্তাবিত এ সেতু উত্তরাঞ্চলের সাথে দেশের বৃহত্তর অংশের যোগাযোগ এক ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করবে। শুধু উত্তরাঞ্চলের জনগণই এ সেতুর সুফল ভোগ করবে না, বরং সমগ্র দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সেতু এক নবযুগের সূচনা করবে। একদিকে এ আশা ও আকাঙ্খা, অপরদিকে টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের হাজার হাজর মানুষ তাদের জমি ও বসতবাড়ি হারিয়ে এক অনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংগে এ প্রকল্পের পার্থক্য এই যে, এতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থার পরামর্শ ছিল ক্ষতিগ্রস্তদের এমনভাবে পুনর্বাসিত করা যাতে তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান অব্যাহত রাখা যায়। তদনুসারেই যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

পুনর্বাসন প্রকল্প প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজন প্রকল্পে ক্ষতিগস্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সঠিক তথ্যা যদিও যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ সম্পর্কে এর আগেই দু'একটি জরিপ হয়েছে, এগুলোর কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই সেতু কর্তৃপক্ষ ব্র্যাককে অনুরোদ করে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন উপযোগী এমন একটি জরিপ পরিচালনা করতে যাতে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সকল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক চিত্র সঠিকভাবে ফুটে উঠে। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ উপরোক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত গবেষণাটি পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ে ১৭ অক্টোবর – ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত জরিপ কাজ চলে, এবং ১৯৯৩ সালের মে মাসে জরিপের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এ গবেষণার উদদেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

ক) যে সকল খানার জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে সকল খানাকে চিহ্নিত করা, এবং অধিগ্রহণকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা;

খ) যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার আইনগত বা বৈধ মালিককে চিহ্নিত করা;

গ) অধিগ্রহণের পর কোন খানার কি পরিমাণ জমি অবশিষ্ট থাকবে তা নিশ্চিত করা; এবং

[3] Summary of the RED research report entitled "Jamuna multipurpose bridge: survey of residual land and project affected persons" by TK Barua, et. al., 1993 May. 284p. (Summarized in Bangla by KE Kabir)

ঘ) পরোক্ষভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (যেমনঃ বর্গাচাষী, কৃষি ও অকৃষি শ্রমিক, বস্তিবাসী, ছোট বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি) তাদের চিহ্নিত করা।

জরিপে দেখা গেছে, টাঙ্গাইলের ৪,১৩১টি ও সিরাজগঞ্জের ২,০২৫টি, অর্থাৎ মোট ৬,১৫৬টি খানা জমি বা অন্য সম্পদ হারিয়েছে। এ খানাগুলোতে টাঙ্গাইলে ৩৯,৪২২ জন এবং সিরাজগঞ্জে ১২,৮২৪ জন, অর্থাৎ মোট ৫২,২৪৬ জন মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এ গবেষণায় টাঙ্গাইলের ১০৭টি খানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা জমি হারিয়েছে কিন্তু জমির পরিমাণ জানা যায়নি।

যমুনা সেতুর জন্য ৩২টি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো মধ্যে রয়েছে মসজিদ ১৪টি, প্রাথমিক স্কুল ৬টি, মাদ্রাসা ৬টি, মাধ্যমিক স্কুল ২টি, কবরস্থান ১টি এবং মক্তব ১টি।

টাঙ্গাইলে যারা জমি হারিয়েছে তাদের মধ্যে ১১.৭ শতাংশ খানা হারিয়েছে শুদধুমাত্র বসতবাড়ি, ৬১.১ শতাংশ হারিয়েছে শুধমাত্র কৃষি জমি, ২৬.৭ শতাংশ হারিয়েছে বসতবাড়ি ও কৃষি জমি উভয়ই এবং মাত্র ৫ শতাংশ হারিয়েছে পরিত্যক্ত জমি। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জে যারা জমি হারিয়েছে তাদের মধ্যে ১৬.৩ শতাংশ খানা হারিয়েছে শুধুমাত্র বসতবাড়ি, ৬৭.১ শতাংশ হারিয়েছে শুধুমাত্র কৃষি জমি, ১৪.৬ শতাংশ হারিয়েছে বসতবাড়ি ও কৃষি জমি উভয়, এবং ২ শতাংশ হারিয়েছে পরিত্যক্ত জমি।

জমি অধিগ্রহণের আগ থেকেই দুই জেলা মিলিয়ে ৬১২টি খানার কোন কৃষ জমি ছিল না, পুরো কৃষিজমি হারিয়েছে ১,১৬৯টি খানা, কোন কৃষি জমি যায়নি ২৪৯টি খানা এবং কিছু কৃষি জমি হারয়েছে ৪,০০৯টি খানা। অন্যদিকে ৩,৮৭৩টি খানা বসতবাড়ির কোন জমি হারায়নি। পুরো বসতবাড়ি হারিয়ছে ১,৬৯৩টি খানা এবং আংশিক বসতবাড়ি হায়েছে ৪৭৩টি খানা।

মোট ৫,৯০৬টি খানার অধিবাসীরা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদের মধ্যে বর্গাচাষী ছিলা ৫৬১টি খানায়, কৃষি মজুর ছিলো ২,৪৬২টি খানয়, অকৃষি মজুর ছিলো ৬১৮টি খানায়। ঐ এলাকায় ছোট বড় ব্যবসা ছিলো ৯টি খানার আর ২,১৭৫টি খানা বস্তি করে বসবাস করত।

জরিপভুক্ত খানাগুলোর মধ্য থেকে টাঙ্গাইলে ৪,৫৬৩ জন এবং সিরাজগঞ্জে ২,১৭৩ জন দাবী করেছে যে, তারা জমি হারাতে যাচ্ছে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের ৪ শতাংশ এবং সিরাজগঞ্জের ৬.১ শতাংশ মহিলা। এর মধ্যে ৮১০টি ক্ষেত্র পাওয়া গেছে যেগুলোকে ক্ষতিপূরণের অংশ বোন বা এমন নিকট আত্মীয়কে দিতে হবে যারা বর্তমানে এই খানার সদস্য নয়।

সরকারি কর ফাঁকি ও জমি রেজিস্ট্রেশন অফিসে দাবীকৃত ঘুষের টাকার কারণে জমির দাম কম উল্লেখ করা হয়। ফলে জমির মালিকগণ চলতি বাজার মূল্যের চেয়ে জমির দাম কম দেখানোর কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারকে ঠকাতে গিয়ে তারা নিজেরাই ঠকছে।

এই সব সম্পদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ও অধিগ্রহণ আইনের ব্যাখ্যায়ও অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে। সিরাজগঞ্জের চেয়ে টাঙ্গাইলের সম্পদের মূল্য বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্য নির্ধারণের আরও অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিভাবে ক্ষতিপূরণের দর নির্ধারণ করতে হবে তার আইনও স্পষ্ট নয়। তাছাড়া

ভূমি অফিসের হিসাবের সাথে ক্ষতিপূরণের পরিমাণের গরমিল লক্ষ্য করা গেছে। কখনো ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কম, অবার কখনো বেশি।

ক্ষতিপূরণের অর্থ কিভাবে খরচ করেছে? জরিপে দেখা গিয়েছে, শতকরা ২৭.৬১ ভাগ অর্থ চলতি ভোগ্যপণ্য ও ঋণ পরিশোধে এবং ২২.১২ ভাগ জমি ক্রয়ে খরচ করা হয়েছে।

টাঙ্গাইলের ক্ষতিগ্রস্তরা জরিপকাল পর্যন্ত মোট ৯৭,০২৫,৭৬১ টাকা পেয়েছে এবং এ টাকা পেতে তাদের ৮,৫৪৭,০৯৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বলে তারা উলেøখ করেছেন। অর্থাৎ প্রাপ্ত টাকার শতকরা ৮.৮১ ভাগই ঘুষের জন্য ব্যয় হয়েছে। সিরাজগঞ্জে এই ঘুষের পরিমাণ ২,১৯৪,৬৬৯ টাকা যা প্রাপ্ত টাকার শতকরা ৯ ভাগ। বেশির ভাগ ঘুষের টাকাই দিতে হয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের।

উপসংহারে বলা যায়, পুনর্বাসন পরিকল্পনা ভাল হওয়াই যথেষ্ট নয়, তা বাস্তবায়নে আন্তরিক ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকের প্রয়োজন। তা না হলে ভাল পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জেলা পর্যায়ের যে সব কর্মকর্তা সম্পদ অধিগ্রহণের সাথে জড়িত পুনর্বাসন কাজে তাদের জড়িত না করাই ভাল।

তাছাড়া জমি বেচা-কেনার সময় যেসব দলিলপত্রে সঠিক দাম উলেøখ করা হয়নি সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। কিছু অসৎ ক্রেতা-বিক্রেতা ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তার কারণে প্রকৃত ভূমি মালিকরাই ক্ষতিপূরণ কম পাচ্ছে। এটা রোধ করা প্রয়োজন। প্রতিটি শ্রেণীর ভূমিকার জন্য মৌজাভিত্তিক আলাদা মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।

পুনর্বাসনের পর নতুন ও পুরাতন বাসিন্দাদের মধ্যে সমঝোতা বাড়ানোর জন্য সৃজনশীল উদ্যোগ নিতে হবে। নতুনভাবে বসতি স্থাপনকারীদের পুরনোরা অবাঞ্ছিত মনে করতে পারে। পশ্চিম তীরের সরাটিয়ার বাসিন্দাদের মধ্যে পুনর্বাসিত নতুন লোকজনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের পেশাগত প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দক্ষ শ্রমিকদের কাজে লাগানোর উদ্যোগও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকায় জমির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে এর ফলে অনেক প্রান্তিক ভূমিমালিক ভূমিহীন হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টির প্রতি সেতু কর্তৃপক্ষের নজর দেযা দরকার।

যাদের ভূমির উপর দিয়ে যমুনা সেতু রচনা করতে যাচ্ছে যোগাযোগ ও উন্নয়নের নতুন সেতুবন্ধন, সেই জনগণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে যেন যমুনার দু'পারের বাতাস ভারী হয়ে না উঠে।

দরিদ্রদের আইন জ্ঞান ঃ নির্বাচিত বেসলাইন তথ্য[4]

এস আসাদ আহমেদ ও এস মুস্তাফা

পটভূমি

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসাবে সমাজ কতগুলো বিধিবদ্ধ আইন মেনে চলে। এই আইনগুলো সমাজের সদস্যদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যদি এই আইনসমূহ সম্পর্কে অবগত না থাকে অথবা এ সম্পর্কে তাদর কোন ধারণা না থাকে তাহলে দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিবাদ ঘটে সেগুলোর সমাধান কিভাবে হবে। যেসব আইন দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে সেসব আইন সম্পর্কে বাংলাদেশের পল্লী এলাকার বেশির ভাগ লোকের বিশেষ করে মহিলাদের ধারণা নিতান্তই কম। এর ফলে বিশেষ করে মহিলারা পুলিশ বা সরকারি সংস্থা বা অন্য গ্রামবাসীদের বেআইন বা বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন না।

গৃহস্থালির বিবাদ, ভূমি নিয়ে সংঘাত, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বাংলাদেশের পল্লীএলাকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং এসব ক্ষেত্রে দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিচারের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে ব্র্যাক ১৯৮৬ সালে মানিকগঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে প্যারালিগ্যাল বা প্রয়োজনীয় আইন শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে, এবং ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫টি এলাকা এর আওতায় আনা হয়। ব্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং গ্রাম সংগঠনের সদস্য নন কিন্তু গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের মত আর্থ-সামাজিক (ও বয়স) বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের আইন সম্পকে জ্ঞান যাচাই করার জন্যই এ সমীক্ষাটি করা হয়।

ড়পযঘইভা মংপষমষগত

পারিবারিক আইন, ভূমি আইন, উত্তরাধিকার আইন এবং নাগরিক অধিকারের ন্যায় কতিপয় বিষয়ে আইন সম্পর্কে পল্লীএলাকার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের জ্ঞানের স্তর পরিমাপের জন্যই এ বেসলাইন সমীক্ষা করা হয়। এ বিষয়গুলো মধ্যে আরো রয়েছে বিবাহ, যৌতুক, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভোট, জমি এবং পুলিশ। একটি বেসলাইন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ সমীক্ষা করা হয় যা অদূর ভবিষ্যতে ব্র্যাকের প্যারালিগ্যাল বা প্রয়োজনীয় আইননশিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয়ে সাহায্য করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তিনটি আরডিপি অঞ্চলের ছয়টি এলাকায় মোট ৮৫২ জন অংশগ্রহণকারী প্রশ্নমালার উত্তর দেন যাদের মধ্যে ৫৪৩ জন মহিলা এবং ৩০৯ জন পুরুষ। এদের

[4] Summry of the RED researh report entitled “Legal knowledge of the poor: selected baseline information (volume 1)” by S Asad Ahmed and S Mustafa, 1993 July, 43p. (Summarized in Bangla by DK Fuad Hasan)

মধ্যে ৬১২ জন ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং ২৪০ জন সদস্য নন। উত্তরদাতাদের দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়।

বাংলাদেশের উত্তর, মধ্য-পশ্চিম এবং মধ্য এলাকার তিনটি আরডিপি অঞ্চলের ১২টি এরিয়া অফিস সমীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এসব এলাকায় ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে প্যারালিগ্যাল বা প্রয়োজনীয় আইন শিক্ষা কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সমীক্ষাটি কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে পরিচালিত হয়।

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

বসতবাড়িঃ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ধারণের তাদের বসতভিটার অবস্থা, আয়, শিক্ষার স্তর, বৈবাহিক অবস্থা, বাড়ির আয়তন এবং ব্র্যাক বহির্ভূত ঋণ পরিস্থিতি বিবেচনায় আনা হয়। একটি বসতবাড়ির মালিকানা একজন আশ্রয়হীনের তুলনায় ভাল অবস্থার পরিচয়জ্ঞাপক। বাস্তুভিটাহীন একজনকে আশ্রয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যদের উপর নির্ভর করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি (৩৫%) উত্তরদাতার কোন বসতভিটা নেই।

আবাদযোগ্য ভূমিঃ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন এবং যাদর ৫০ শতাংশের জম জমি রয়েচে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (৯৫%)। গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং অসদস্য ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ। তবে বিভিন্ন আরডিপি এলাকায় এ হারে সামান্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাঃ তিনটি আরডিপি অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গড়ে শতকরা ৭৩ ভাগ অক্ষরজ্ঞানহীন। এ সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের দুই দলে ভাগ করা হয়। প্রথম দলে যারা অক্ষরজ্ঞানহীন এবং লিখতে পড়বে পারে না এবং অপর দলে যারা লিখতে পড়তে পারে। সমীক্ষায় দেখা যায়, তিনটি আরডিপি অঞ্চলে ১৭৫ জন প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন (৭৭%) এবং ৫২ জন (২৩%) লেখাপড়া করেছেন দশম শ্রেণী পর্যন্ত। গ্রাম সংগঠনের সদস্য নন এমন মাত্র একজন মহিলা পাওয়া যায় যিনি মাধ্যমিক স্তরের উপরে ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

বৈবাহিক অবস্থাঃ তিনটি অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ উত্তরদাতা ছিলেন বিবাহিত, শতকরা ৫ ভাগ ছিলেন বিধবা এবং ১.৫ ভাগ ছিলেন তালাকপ্রাপ্ত। সকল বিবাহিত উত্তরাদাতাদের (৭৯২ জন) মধ্যে ৫৫৪ জন (৬৯.৯৫%) ছিলেন ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্য।

পরিবারের আয়তনঃ উত্তরদাতাদের পরিবারের গড় আয়তন ছিল ৫.৩। এ সংখ্যা পরিবারের গড় আয়তনের জাতীয় সংখ্যা (৫.৩) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং অসদস্যদের মধ্যে পরিবারে আয়তনে তেমন কোন তারতম্য লক্ষ্য করা যায়নি।

বিভিন্ন আইন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা

পারিবারিক আইন (Family Law)ঃ পরিবারই হচ্ছে সমাজের মূল একক বা unit। জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য পারিবারিক আইনের উদ্ভব হয়। পারিবারিক আইন সম্পর্কে পল্লী এলাকার সবচেয়ে দরিদ্রদের জ্ঞানের স্তর পরিমাপের জন্য একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। আইন অনুযায়ী একজন পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স হচ্ছে ২১ বছর। সকল উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৭০ জন (৩১.৭%) এ সম্পর্কে সঠিক উত্তর দেন। সদস্য এবং অসদস্যদের মধ্যে কিছুটা তফাত লক্ষণীয় (যথাক্রমে ৩৪% এবং ২৬%)। পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন বয়সের কথা উল্লেখ বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়। বেশির ভাগ মহিলা মনে করেন পুরুষদের বিয়ের বয়স সীমা ২১ বছরের নীচে এবং মহিলাদের সম্পর্কে পুরুষদের উত্তরও ছিল অনুরূপ। সকল উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৪ জন (৮.৭%) আইন অনুযায়ী মহিলাদের বিয়ের সঠিক বয়স বলতে পেরেছিলেন। ৫৯০ জন উত্তরদাতা ৬৯.২%) বলেছেন, বিয়ের বয়স ১৮ বছরের নীচে এবং শতকরা ২১ ভাগ বলেছেন ১৮ বছরের উপরে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৫ জন (১৪%) গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং ২৪ জন (১০%) অসদস্য বলেছেন, কাজী অফিসের মাধ্যমে সঠিকভাবে বিয়ে হতে পারে এবং আইন অনুযায়ী সঠিকভাবে নিবন্ধন না হলে বিয়ে বৈধ হয় না। বেশির ভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন, বিয়ে আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হওয়া উচিত। গ্রাম সংগঠনের শতকরা ৫৪.৭ ভাগ সদস্য এবং ৫০ ভাগ অসদস্য যৌতুক দেয়া-নেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, গ্রাম সংগঠনের শতকরা ২৪ ভাগ সদস্য এবং ৩০ ভাগ অসদস্য মনে করেন যৌতুকের জন্য আইনে কোন শাস্তি নেই। গবেষণায় দেখা যায়, ১৮০টি বিয়েতে যৌতুক বিনিময় হয়েছে অপরদিকে ২৬৭টি বিয়েতে যৌতুক দেয়া নেয়া হয়নি। সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, যৌতুক সম্পর্কিত আইন সম্বন্ধে মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের সঠিক জ্ঞান কিছুটা বেশি। এ বিষয়ে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। শতকরা ৪০ ভাগ উত্তরদাতা হয় এ বিষয়ে জানেন না বলে উত্তর দিয়েছেন অথবা এ আইন সম্পর্কে বাস্তববর্জিত ধারণা পোষণ করেন। যৌতুকের অভিশাপ দূর করার জন্য এদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন হতে পারে।

'তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এ ধারণা দেশে এখনও বিদ্যামন। এ জন্য আমরা প্রশ্ন করি যে, কোনো দলিলপত্র ছাড়া তালাক বৈধ কি না? আশার কথা শতকরা ৭৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন বৈধ নয়। এদের মধ্যে ৪৮৭ (৮০%) জন গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং ১৮২ (৭৬%) জন অসদস্য। আবার ১৮১ (৩০%) জন গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং ৭০ (২৯%) জন অসদস্য তালাকের বৈধ পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক উত্তর দিয়েছেন। যদিও যৌতুক এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মত 'হিল্লা নিকাহ' প্রচলিত নয় তবুও পল্লী এলাকায় এটা মাঝে-মধ্যে হয়ে থাকে, ৫৬০ জন জানিয়েছেন তাদের এলাকায় গত ৬ মাসে কোনো হিল্লা নিকাহ হয়নি। তবে ৩১ (৪%) জন জানিয়েছেন একই সময়ে তারা অন্ততঃ ১টি হিল্লা নিকাহর কথা শুনেছেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর নাবালক সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নেবে? এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় সকল উত্তরদাতাই (শতকরা ৯০ ভাগ এর বেশি) সঠিক উত্তর দিয়েছেন।

উত্তরাধিকার অইন (Law of Inheritance) ঃ সমীক্ষায় দেখা যায়, উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে পল্লী এলাকার জনসাধারণের জ্ঞানের স্তর অত্যন্ত দুর্বল। যদিও বেশির ভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন, মহিলারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিন্তু মহিলারা তাদের পিতা বা স্বামীর উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তি কত অংশ

পাবেন সে সম্পর্কে তারা বেশির ভাগই অজ্ঞ। তবে ব্র্যাক সদস্যদের জ্ঞান অসদস্যদের চেয়ে বেশি (যথাক্রমে ২% এবং ১২%)।

ভূমি আইন (Lland Law) ঃ যদিও ভূমিই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পৃদ তবুও এর মালিকানার জন্য আইনগত প্রমাণের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শতকরা তিন থেকে চার ভাগ উত্তরদাতা ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে চারটি আইনি প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে পেরেছেন। একটিও আইনি প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে পারে নাই, এদের মধ্যে ব্র্যাক সদস্য (৩৪%) এবং অসদস্যের (৩১%) তেমন তফাত নেই। নারী-পুরুষের তফাত সদসস্যের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি।

বর্গাচাষ সম্পর্কে যদিও আইনে শস্যের একভাগ ভূমি মালিক, একভাগ বর্গাদার এবং একভাগ উপকরণের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কিন্তু বেশির ভাগ দরিদ্র লোকই এ সম্পর্কি অবহিত নন। চার-পঞ্চমাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, অর্ধেক ফসল বর্গাদারের প্রাপ্য এবং বাকী অর্ধেক ভূমি মালিকের। খুব সামান্য সংখ্যক উত্তরদাতা কৃষি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরির (৩.৫ কেজি চালের মূল্যের সমান অর্থ) কথা জানেন।

নাগরিক অধিকার (Citizen's Right)ঃ জাতিসংঘ নাগরিক অধিকার সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। সুষ্ঠু, সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সকল দেশের জনগণের নাগরিক অধিকার প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে যেখানে সাক্ষরতার হার শতকরা ২৫ ভাগ পার হয়নি সেখানে জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বার্তা বেশির ভাগ লোকের কাছে নাও পৌঁছতে পারে। সমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ গ্রাম সংগঠনের সদস্য ও অসদস্য উত্তরদাতা মনে করেন পুলিশ বা চৌকিদার কাউকে বিনা কারণে গ্রেফতার করতে পারে না। তব একটা লক্ষণীয় যে, শতকরা ২৫ ভাগ জানেন না যে পুলিশ তা কেন পারে না।

ভোটার হওয়ার বয়স সীমা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ১৫৯ জন (১৮.৭) সঠিক উত্তর দিয়েছেন। সদস্য-অসদস্য এবং নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন কোন তফাত নেই। গ্রাম সংগঠনের ২১৫ (৩৫%) জন সদস্য জানিয়েছেন ভোটারের বয়স সীমা ১৮ বছরের কম এবং ৮২ (৩%) জন অসদস্য একই উত্তর দিয়েছেন। ভোটারে সর্বনিম্ন বয়স সম্পর্কে জানা একটি নাগরিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার একটি সূচক। কিন্তু এ সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যাপক তারতম্য থেকে ধারণা করা যায় জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড রাখার কোন সঠিক পদ্ধতি না থাকার ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের হার উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

এ সমীক্ষায় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ৪৩টি আইন সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ধারণা পাওয়া যায়। তাদের এ ধারণ অনেক প্রশ্নের অবতারণা করতে পারে যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পারিবারিক আনি, উত্তরাধিকার আইন, ভূমি আইন এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং অসদস্যদের জ্ঞানের স্তর প্রায় সমান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রাম সংগঠনের সদস্যরা

অসদস্যদের চেয়ে সামান্য বেশি জানেন। আমরা ধরে নিতে পারি ব্র্যাকের সংশ্লিষ্টতার কারণেই এটা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, গ্রাম সংগঠনের সদস্য এবং অসদস্য উভয়েই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আইন সম্পর্কে জানেন, যেমনঃ মহিলারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কি না। কিন্তু তাদেরক যখন সম্পত্তিতে মহিলাদের অংশ সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করা হয় তখনই দেখা যায়, তারা এ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণেই এটা হতে পারে।

পল্লী এলাকা বসবাসকারীদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়েজনীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প এটা প্রমাণিত হয়েছে। সমীক্ষায় এটা দেখা যায়নি যে, গ্রাম সংগঠনের সদস্যরা অসদস্যদের চাইতে বেশি জানেন। স্বল্প সংখ্যক লোকের প্রয়োজনীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞানের কারণে এটা বলা যায় যে, প্যারালিগ্যাল কার্যক্রম ব্যাপক আকারে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে প্যারালিগ্যাল কর্মসূচির প্রভাব নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ বিষয়ে আরো সমীক্ষা পল্লীর দরিদ্র জনসাধারণকে আইনি ক্ষমতায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত সাহায্য করবে। নিম্নোক্ত বিষয়ে আরো সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারেঃ

তালাক ঃ তালাক কেন হয়? নিজের, পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে তালাকের প্রভাব কি?

যৌতুকঃ যদিও শতকরা ৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যৌতুক শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শতকরা ৫০ ভাগ মনে করেন যৌতুক ভাল নয় বরং খারাপ, তাহলে এতা বেশি লোক কেন যৌতুক দেয়া-নেয়া করে থাকেন বা পছন্দ করেন? কেন একটাকে বেশির ভাগ লোকের জন্যই অভিশাপ এবং কিছু লোকের জন্য সৌভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় না?

হিলা নিকাহঃ হিল্লা নিকাহ যদিও খুব প্রচলিত নয় তবুও মানুষ কেন এখনও এটা গ্রহণ করে থাকে?

ভোটঃ ভোটের অধিকার, ভোটের জন্য প্রচারণা এবং নির্বাচনের সময় কিভাবে ভোট দেয়া হয় সে বিষয়ে আর সমীক্ষা হতে পারে।

ব্র্যাকের রেশম চাষ প্রকল্পঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ[5]

দিলরুবা বানু, করিমুল হক, আবুল কালাম, মাহমুদা রহমান খান, অখতার হোসাইন মলিক ও আবু ইউসুফ

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ বেশম শিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম কয়েক বছর রেশম চাষ শুধুমাত্র রাজশাহী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বার্ষিক উৎপাদনের হার ছিল খুই কম। ১৯৮৫ সালে উৎপন্ন সুতার শতকরা ২৫ ভাগ দেশের কাপড় বুনন। শিলব্যেবহৃত হত এবং বাকি অতি উন্নতমানের সুতা বিদেশে রফতানী হত। ফলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের চাহিদার ৪০ ভাগ মিটাতে পারতে। প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন এবং দেশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে ব্র্যাক মানিকগঞ্জে প্রথম রেশম চাষ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে।

ব্র্যাকর রেশম চাষ প্রকল্প

প্রধানত: গ্রামীণ মহিলারাই রেশম চাষ প্রকল্পের সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত। পুরুষরা বীজাগার ও তুঁত চারা বপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকে ১৯৭৮ সালে মানিকগঞ্জে রেশম চাষ শুরু করে ব্র্যাক বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বীজাগার ও বনায়নের মাধ্যম তুঁত গাছের চাষ, রোগমুক্ত ডিম সরবরাহ ও উন্নত জাতের পশুপালন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করছে।

১৯৯২ এর জুনে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এর রেশম চাষ প্রকল্পের উপর গবেষণার সিদ্ধান্ত নেয়। আরআরএ (Rapid Rural Appraisal) ও পিআরএ (Participatory Rural Appraisal) পদ্ধতি ব্যবহার করে জামালপুর, শেরপুর এবং মানিকগঞ্জের দশটি গ্রামে এ গবেষণা চালানো হয়। পিআরএ হল একটি উন্নয়নমূলক এ্যাপ্রোচ যাতে কোন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কেন প্রকল্পে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রকল্প বিষয়ক সকল স্তরে গ্রামীণ জনগণ অংশগ্রহণ করতে পার।

গবেষণার ফফলাফল

জরিপে দেখা যায়, বীজাগার ও তুঁতগাছের পাহারাদাররা সামগ্রিকভাবে রেশম প্রকল্পকে লাভজনক মনে করেন। বনায়ন কর্মসূচিতে গড়ে ৬০-৭৫ ভাগ তুঁতগাছ বাঁচে যা প্রকৃতই লাভজনক। রেশম গুটি পালনের মাঝামাঝি পর্যায়ে পলুপালনকারীদের দিনে প্রায় ১১ ঘন্ট শ্রম দিতে হয়, যা গৃহকর্মের পর তাদের জন্য অনেকটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অধিকাংশ পলুপালনকারীরা প্রয়োজনের তুলনায় কম রোগমুক্ত ডিম পায়। ফলে গড়ে চারটি রেশম পোকার একটি রোগে মারা যায়। ডিম সরবরাহের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়াতা ফলে খুব অল্প পলুপালনকারীই সঠিক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ পশুঘর নির্মাণ করে।

[5] Summary of the RED research report entitled “A rapid rural appraisal of the present status an future prospects of BRAC’ sericulture programme” by Dilruba Banu, et. al., 1993 September, 52p (Summarized in Bangla by Md Nasir Uddin)

প্রতি ১০০টি রোপগমুক্ত ডিম থেকে প্রতি সাইকেলে (প্রতি ৪ মাসে এক সাইকেল) ১৭-২০ কেজি রেশমগুটি উৎপাদিত হয়, যা ব্র্যাকের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে উৎপাদনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ডিমের সরবরাহ নিশ্চিত ও রোগের সমস্যা কিছুটা দূরীভূত হলে উৎপাদন আরো বহুগুণের বাড়ানো সম্ভব। কিছু নতুন এলাকার পলুপালনকারীরা বাৎসরিক ফলন চারের অধিক এবং প্রতি ফলনে রেশমগুটির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করছে।

ব্র্যাক বর্তমানে রেশম চাষের প্রতিটি ধাপের কার্যক্রম পরিচলনা করলেও সূতাকাটা ও কাপড় বুননে কতটা সক্রিয় অংশ নিবে, তা এখানো ঠিক হয়নি। এ প্রকল্প কার্যতঃ তুঁতচাষ ও রেশম পশুপালনের উপর নিবদ্ধ।

রেশম পোকা প্রধানতঃ দু'ধরনের। একটি বাইভোল্টাইন জাত, যা পরিমিত তাপমাত্রায় বৃহৎ রেশমগুটি ও ভাল সূতা তৈরিতে সক্ষম, কিন্তু খুব সহজে রোগে আক্রান্ত হয়। অন্যটি মাল্টিভোল্টাইন জাত, যা উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়া অর্থাৎ আমাদর দেশের আবহাওয়া উপযোগী। মাল্টিভোল্টাইনজাত পোকা আকারে ছোট এবং তা থেকে তৈরি সুতাও কিছুটা নিম্নমানের হয়। সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যবহৃত সব পোকাই মাল্টিভোল্টাইন জাত। প্রত্যেক পলুপালনকারী বছরে চাটি ফসল উৎপন্ন করে। তবে আটটি পর্যন্ত করা সম্ভব।

তুঁত বীজাগার ও তুঁত বনায়ন

রেশমচাষ প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি এলাকার সামান্য সংখ্যক জমিতে তুঁত বীজাগার তৈরি করে উৎপাদন শুরু করা হয়। ব্র্যাক কর্তৃক সরবরাহকৃত তুঁত গাছ রোপণ করে এক বছর পরিচর্যা করা হয়। পাহারাদাররা ঐ সময় প্রতিদিন মাথাপিছু বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে বিনামূল্যে তিন কেজি গম পায়। বছরের শেষ তারা ঐ সমস্ত চারাগাছ প্রতিটি ১.২৫ টাকা দরে ব্র্যাকের নিকট বিক্রয় করে।

পট্টসমূহ সাধারণতঃ ০.৭৫ একর বিশিষ্ট, যা ১৮,০০০ চারা উৎপাদনের সক্ষম। এ পর্যন্ত ২৩০টির মত এ ধরনের পট্ট তৈরি করা হয়েছে। তুঁত চাষের চারটি স্তর রয়েছেঃ (১) জমি তৈরিকরণ, (২) জীব বপণ ও বেড়া নির্মাণ, (৩) আগাছা নিড়ানো, এবং (৪) সেচ দেয়া।

তুঁত বনায়নের ক্ষেত্রে পাহারাদারদে প্রথমে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ দেযা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাথে ব্র্যাক আলোচনা করে রাস্তার পাশের জমি ২০ বছরে চুক্তিতে লিজ নেয়। প্রাথমিক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্র্যাক বিনামূল্যে সহায়তা করে। প্রথম বছর প্রত্যেক তত্ত্বাবধানকারীকে ৫০০টি গাছের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২য় ও ৩য় বছরে যখন কাজের চাপ হ্রাস পায়, তখন প্রত্যেককে ১,০০০টি গাছ দেখাশুনা করতে হয। পরবর্তীতে পাহারাদারদের রেশম পলুপালনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তুঁত বনবায়নের নিম্নোক্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঃ

- অন্যান্য ফসল উঠানোর মওসুম থাকার ফলে তুঁতচারার গর্ত খনন কাজে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য পাওযা যায় না।

- এপ্রিল–মে মাসের প্রচুর ঝড় ও বৃষ্টিপাতের দরুন অনেক চারাগাছ নষ্ট হয়ে যায়।

- শুষ্ক মওসুমে সকল চারাগাছের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

- আগস্ট মাসের তাপদাহে পাহারাদারগণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন।

- বড়ির আবাসভূমিতে তুঁতচাষ করা হলে অন্যান্য গাছপালার সাথে প্রতিযোগতামূলকভাবে তুঁতচাষ বাধাগ্রস্ত হয়।

- কখনো কখনো রাস্তার পাশের জমির মালিক তুঁতগাছের ছায়ায় তার ফসলের ক্ষতি হবে, এ ভয়ে বনায়নে বাধা দেয়।

- যে ভূমিতে বালির পরিমাণ বেশি সেখানে তুঁতগাছের রোগ দেখা দেয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে তূঁতগাছ বাঁচানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

- দৈনিক প্রায় ৯ ঘন্টা শ্রম পাহারাদারদের দৈনন্দিন কাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিশেষতঃ রান্না করা, বাচ্চা প্রতিপালন ইত্যাদি এতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

অধিকাংশ পাহারাদার বাস্তুভিটায় তুঁতচাষে আগ্রহী নয়। তুঁতচাষ অপেক্ষা ফল ও অন্যান্য গাছ লাগানোকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। এ সত্ত্বেও কয়েকটি ইতিবাচক দিক বিবেচনায় রেখে অনেকে আবাসভূমিতে তুঁতচাষকে প্রাধান্য দেয় যেমন, কম যত্ন, সেচ সুবিধা ও ভূমি ক্ষয়ের কম ঝুঁকি।

পলুপালন, পলুঘর ও রোগমুক্ত ডিম হতে গুটি উৎপাদন

চকি পলুপালন ও অভিজ্ঞ পলুপালনকারীদের ব্র্যাক বছরে যথাক্রমে ৫০০ থেকে ৬০০ এবং ৫০ ধেথকে ১০০টি রোগমুক্ত ডিম সরবরাহ করে। অভিজ্ঞ পলুপালনকারীদের অভিযোগ, তারা ২০ থেকে ২৫টি রোগমুক্ত ডিমের বেশি সরবরাহ পায় না। কোন কোন ব্যাচের ডিম পেবরাইন রোগে আক্রান্ত থাকায় সব কীট মারা যায়। যেহেতু রোগমুক্ত ডিম সরবরাহের অভাব রয়েছে, পলুপালনকারীরা অনেক অর্থ ব্যয় করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বলিত পশুঘর তৈরি করে না। সাধারণত: পলুপালনকারীরা গড়ে মাত্র ১,৬০০ টাকা ব্যয় করে সামান্য যন্ত্রপাতি সম্বলিত পশুঘর তৈরি করে অনেক পলুপালনকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেলফ ও রেশম গুটির ট্রে রয়েছে। কিন্তু বহুসংখ্যক পলুপালনকারীরা একটি ট্রেতে নির্দিষ্ট পরিমাণ গুটির পরিবর্তে দ্বিগুণেরও অধিক রেশমগুটি রাখে, যা ক্ষতিকর। সঠিক পরিমাণের শেলফ, বাতাস চলাচলের উপযোগী পশুঘর, ফ্রেমের পায়াগুলো পানি বা কেরোসিনের পাত্রে ডুবিয়ে রাখার ব্রবস্থা, ফরমলিনের ছোপ দেয়া ইত্যাদি পলুঘরের আদর্শ ব্যবস্তা হলৌ অনেক পলুপালনকারীদে তা করতে দেখা যায় না।

গবেষণায় দেখা গেছে, ২৬ জন পলুপালনকারী যাদের মধ্যে পাঁচজন চকি পলুপালনকারী ছিল, তাদের গড়ে বছরে ১০০টি রোগমুক্ত ডিম থেকে ১৩.৯৯ কেজি গুটি উৎপাদাতি হয়। বিভিন্ন কারণে বেশ কিছু

ডিম নষ্ট হয়। যদি ডিম নষ্ট না হয় তবে ব্র্যাকের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৮.৫ কেজি গুটি উৎপন্ন হতে পারে। ১০০ রোগমুক্ত ডিমের স্বাভাবিক উৎপাদন হচ্ছে ২০.৩ কেজি, যা সবচেয়ে কম উৎপাদন ১৬.৮ কেজি থেকে শতকরা ২১ ভাগ বেশি।

অর্থনৈতিক বিকাশ ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

গ্রামীণ শ্রম নির্ভর কুটির শিল্প হিসেবে রেশমের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বলা যায়, মহিলাসহ গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং লাভজনক ফসল হিসেবে রেশমের সমকক্ষ অন্য কোন কৃষি ফসল নেই। সর্বোপরি, এর বিনিয়োগ ব্যয়ও খুব কম। বিভিন্ন এলাকার দু'টি চকি এবং তিনটি অভিজ্ঞ পলুপালনকারীদের তুলনামূলক খরচ এবং লাভ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রোগমুক্ত ডিমে ভাল লাভ হয়। চকি পলুপালনকারীরা এ ক্ষেত্রে তিন থেকে চার গুণ বেশি লাভ করতে সক্ষম।

পলুপালনকারীদের মতে অন্যান্য পেশার তুলনায় রেশম চাষ অধিক লাভজনক, আবার অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমান রেশম উৎপাদনের আলোকে ভবিষ্যতে রেশম উৎপাদন এ সব এলাকায় কিভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব, তা চারটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল ঃ (১) বর্তমানে পলুপালনকারীদের মাধ্যমে বছরে চারটির বেশি ফসল উৎপাদন, (২) প্রতি ফসলে আরো বেশি গুটি উৎপাদন, (৩) নতুন গ্রামীণ পরিবারদের এ পেশায় যোগদানে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান, এবং (৪) তুঁত পাতার সহজলভ্যতা।

নতুন পলুপালনকারীর অন্তর্ভুক্তিতে নেতিবচাক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে বিভিন্ন গবেষণা এলাকার অংশগ্রহণকারী নয়, এমন ৩৯ জন ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ১৩ জন এ পেশা গ্রহণ করতে আগ্রহী।

সুপারিশমালা

- যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো বহু সংখ্যক সদস্যকে এ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ ব্র্যাক দিতে পারে।

- তুঁত গাছের বাঁচার হার ও ফলন বৃদ্ধি ঘটাতে বাছাইকৃত স্থানে ও যেখানে অন্যান্য গাছ ও লম্বা ঘাসের আধিক্য না থাকে এমন স্থানে তুঁতচারা রোপণ করা উচিত।

- রোপণ করার পূর্বে পাশের জমির মালিক কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে ব্র্যাককে উক্ত জমি লিজ নেয়ার সময় তা নিশ্চিত করতে হবে।

- কখনো কখনো তত্ত্বাবধনকারী ও পলুপালনকারীদের পারিশ্রমিক পেতে দেরী হয়। এই সমস্যা দূর করা উচিত।

- পলুপালনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া উচিত গ্রেনেজ তৈরির উপর, যা যথেষ্ট পরিমাণ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন সম্ভব করবে।

- মুলনামূলকভাবে বেশি ব্যয়ে আধুনিক উপায়ে পলুঘর তৈরি করতে উৎসাহিত করার জন্য ব্র্যাক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে কিছু সংখ্যক পলুঘর বিভিন্ন প্রয়োজন।

- বর্তমানে রোগের কারণে রেশম পোকার মৃত্যু রোধ করার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডিম ও রেশমগুটির মূল্য ছাড় দেয়া বা সমপরিমাণ মূল্য ধার দেয়া যেতে পারে।

এ সকল ব্যবস্থা চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ বাড়াবে এবং এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

বাংলাদেশের জমির মালিকানা এবং ভোগদখলের ধরন ঃ একটি গ্রাম সমীক্ষা[6]

সাধনা বিশ্বাস, করিমুল হক ও মোঃ রফি

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে এবং এর অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে জমি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সম্পদই নয় বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীল মাধ্যমও বটে। আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্ত উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডই জমির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালের হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৩৮ ভাগ কৃষকই ভূমিহীন। বর্তমানে এই হার ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের জমির মালিকানার ধরন এবং জমির ভোগদখলের রীতি গ্রামের উন্নয়নের জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। তাই গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয় দু'টিকে উপেক্ষা করা যায় না। কৃষি কাজের উপর এ বিষয় দু'টির প্রভাব দেখার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা এবং মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৯০ সালে যশোর জেলার মনিরামপুর থানার মনোহরপুর গ্রামে বেইসলাইন জরিপ করে। এ জরিপের ফলাফল নিচে লিপিবদ্ধ করা হল।

মনোহরপুর গ্রামে ৩২৯ একর জমিতে ২৩২টি পরিবারে মোট ১২১৬ জন লোক বাস করে। জনপ্রতি জমির পরিমাণ ০.২৭ একর যা জাতীয় পরিসংখ্যানের (০.২৫ একর) চেয়ে সামান্য বেশি। শতকরা ১৬ ভাগ পরিবারের কোন জমি নেই, আর মাত্র ৬ ভাগ পরিবার মোট জমির ৩১ ভাগের মালিক।

এ গ্রামের জমি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত – বসতবাড়ি, অনাবাদী কিন্তু চাষাবাদযোগ্য এবং আবাদী জমি। এ গ্রামে শতকরা ২৫ ভাগ পরিবারের বসতবাড়ির জন্য নিজস্ব কোন জায়গা নেই। তারা অন্যের জমিতে থাকে। আর ৬৮ ভাগের বসতবাড়ির জায়গার পরিমাণও নগণ্য (০.০১-০.০৫ একর)। জরিপে দেখা গেছে, বসতবাড়ির জমির মালিকানার বৈষম্য গ্রামে সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি করে। শতকরা ৩৪ ভাগ পরিবারের কোন অনাবাদী জমি নেই। অন্যদিকে মাত্র ৩.৯ ভাগ পরিবার ২৭ ভাগ অনাবাদী জমির মালিক।

শতকরা ২৭ ভাগ পরিবারের কোন আবাদী জমি নেই এবং ২৭ ভাগ পরিবারের আছে নগণ্য (০.১-০.৫ একর) পরিমাণ জমি। এই ৫৪ ভাগ পরিবারের লোকজন অন্যের জমিতে আংশিক বা পূর্ণ শ্রম দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ১৯৯০ সাল নাগাদ জনপ্রতি জমির পরিমাণ কমে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবারগুলো ভেঙ্গে গেছে। এর মূল কারণ পারিবারিক কলহ। পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া এবং সে সাথে অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে অল্প জমির মালিকরা সংসার চালাতে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে অবস্থাপন্ন পরিবারগুলো এ জমিগুলো কিনে নিয়েছে। এভাবে মেরুকরণের মাধ্যমে দিন দিন ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং কিছু সংখ্যত লোক বিশাল ভূমির মালিক হচ্ছে।

---

[6] Summary of the RED research report entitled "Land ownership pattern and land tenure practice: case of a village in Bangladesh" by Sadhana Biswas, et. al., 1993, Noember, 23p. (Summarized in Bangla by Nahid Amin).

মনোহরপুর গ্রামে জমির ভোগদখলের ক্ষেত্রে চার ধরনের রীতি দেখা গেছে-নিজের জমি চাষ, বর্গাচাষ, বন্ধকী চাষ এবং পত্তন চাষ (লিজ)। জমির মালিকরা সাধারণত: নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যাদের জমি আছে তাদের মধ্যে বা যারা ভূমিহীন তাদের মধ্যে জমি বর্গা বা বন্ধক নেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ ছাড়া কিছু গ্রামবাসী আছে, যাদের জমি নেই কিন্তু অনেক টাকা আছে এবং (টাকা ধার দেয়ার) ব্যবসায়ের সাথে জড়িত, তারা জমি বন্ধক নিয়ে থাকে। বেশির ভাগ লোক, যারা জমি বর্গা বা বন্ধক নেয় তারা উপার্জনের জন্য অন্যান্য উৎসের উপরও নির্ভর করে থাকে। সাধারণত: গ্রামে জমি পত্তন দেয়ার প্রচলন খুব একটা নেই। অল্প সংখ্যক পরিবারই পত্তন দিয়ে বা নিয়ে থাকে।

এ কথা হলফ করে বলা সম্ভব নয় যে, মনোহরপুর গ্রামের চিত্রই সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র। তবে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র মনোহরপুর গ্রাম থেকে খুব একটা ভিন্নও নয়। এ গবেষণা থেকে এটা পরিস্কার যে, যদি একটা গ্রামের উন্নয়ন তার নিজস্ব সম্পদ এবং গ্রামবাসীর চেষ্টার মাধ্যমে ঘটতে দেয়া যায়, তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে। গ্রামের ভূস্বামীর উৎপাদনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে এবং সমাজে তাদের সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে বেশি লাভবান হবে। অর্থাৎ এ নীতির ফরে ভূস্বামীরা অন্যদের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধি লাভ করবে। আবার যদি গ্রামের উন্নয়ন বাইরের সম্পদ যোগানোর মাধ্যমে গ্রামবাসীর দ্বারা ঘটতে দেয়া যায়, তবুও উন্নয়নের ধারা গ্রামের প্রতিটি পরিবারের ক্ষেত্রে এক রকম হবে না। এক্ষেত্রে, ভূস্বামীরা তাদের শক্তি এবং অবস্থানের কারণে গ্রামের উন্ননের জন্য প্রদত্ত বহিঃসম্পদের মোট অংশ নিজেরাই ভোগ করবে।

অন্য আর একটি উপায়ে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রধানত বাইরের সূত্রের সাহায্যে এবং তত্ত্বাবধানে করা যেতে পারে, যেমন ব্র্যাক। তাই এক্ষেত্রে উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জমির মালিকানা এবং জমির ভোগদখলের ধরন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ তথ্যসমূহ টার্গেট বা লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী বাছাই ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সহায়তা করবে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, খামারের আকার এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। ছোট বা মধ্যম ধরনের খামারের উৎপাদন বড় ধরনের খামারের চেয়ে কম। একজন ছোট ধরনের কৃষককে সম্মানজনকভাবে জীবন-যাপন করতে হলে তাকে তার জমির সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু একজন বড় ধরনের কৃষক তার জমির উৎপাদন না বাড়িয়েও একই মানের জীবন ধারণ করতে পারে। এজন্য অন্যান্য কারণ ছাড়াও একজন বড় ধরনের চাষী তার খামারের উৎপাদন ক্ষতমা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য উৎসাহ বোধ করবে না।

তাই, যেসব ভূমিহীন চাষী জমি বর্গা বা বন্ধক নিয়ে জমি চাষ করে তাদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টনের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। সম্ভবতঃ এ ধারণা থেকে সত্তরের দশকে ভূমিহীনদের মধ্যে অনাবদী জমি বন্টনের প্রচলন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু সাধারণত: দেখা যায় যে, কৃষকরা নিজের জমির চেয়ে বর্গা বা বন্ধকী জমিতে খরচ কম তরে। এর ফলশ্রুতিতে বর্গা বা বন্ধকী জমির উৎপাদনশীলতা কমে যায়। তাই এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ, জনসংখ্যার আধিক্য এবং অনাবাদী জমির স্বল্পতার কারণে জমির পুনর্বন্টন করলেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী খুব কমই লাভবান হয়েছে।

পরিশেষে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, গ্রামের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ হচ্ছে ভূমির অসম মালিকানা। যে কোন গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

মানিকগঞ্জের গিলণ্ডা গ্রামে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব[৭]

মিক হাউজ, নরুল আমিন, ইশরাত আরা, দিলরুবা বানু, রামাপদ দে, করিমুল হক, শওকত হোসেন, মাহমুদা রহমান খান, সামস মুস্তাফা, তৈয়বুর রহমান, রিয়াজউদ্দীন ও আবু ইউসুফ

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাক গিলণ্ডা গ্রামে ও তার আশেপাশে উন্নয়ন কর্মতৎপরতা শুরু করে। প্রায় দেড় দশক পর ১৯৯৩ সালে মাঠ পর্যায়ে এ উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়।

মানিকগঞ্জ জেলা শহর থেকে গিলণ্ডা গ্রাম গাড়িতে ১৫ মিনিটের পথ। নবগ্রাম ইউনিয়নের অধিন এ গ্রামটি পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এ তিনটি পাড়ায় বিভক্ত। গ্রামটির এক প্রান্ত ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে কালীগঙ্গা। মোট খানা বা পরিবারের সংখ্যা ৩২০টি। গ্রামের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষই ভূমিহীন। এ গ্রামে ব্র্যাকের ৪টি গ্রাম সংগঠন রয়েছে। শুধু মধ্য পাড়ায় পুরুষদের একটি গ্রাম সংগঠন ছাড়া বাকী ৩টিই মহিলা গ্রাম সংগঠন। প্রত্যেকটি পাড়াতেই মহিলাদের একটি করে গ্রাম সংগঠন রয়েছে। এসব গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা হয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি ও আশির দশকের শুরুতে।

গিলণ্ডার পাশেই বাহিরখোলা গ্রাম অবস্থিত। এখানে ১৯৭৫ সালে গ্রাম সংগঠন গড়ে ওঠে। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব সমস্যা দেখা দেয় এ গ্রামটিতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বাহিরখোলা গ্রাম সংগঠন শুরু হয়েছিল স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে। নির্বাচিত ক্যাশিয়ার বেশ কিছু অর্থ আত্মসাৎ করে এবং আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গীদের মধ্যে তা ভাগ করে নেয়। ধরা পড়ার পর তাকে সরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। বরং এ ধরনের সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

দীর্ঘ ১০ বছর পর ১৯৮৫ সালে একটি সুষ্ঠু স্কীম চালু করা হয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকে সথ্চয়ী হিসাব পরিচালনার ব্যবস্থার করা হয়। যৌথ ঋণের মাধ্যমে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং খাস জমি লীজ নিয়ে পুকুরে মাছের চাষ করা হয়। নিজস্ব সঞ্চয় দিয়ে গবাদি পশু পালনের উদ্যোগও নেয়া হয়।

ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে এ সব যৌথ তৎপরতা বেশি দিন টিকেনি। গভীর নলকূপ অচল হয়ে যাওয়ার পর আর মেরামত করা হয়নি। মাছে পুকুর লাভজনকভাবে চালাতে ব্যর্থ হয়। পরে জনৈক সদস্যা খাস জমি নিকে মাছের চাষ শুরু করে। ১৯৮৭ সালের বন্যায় অনেক গবাদি পশু মারা যাওয়ায় স্কীমটিরও প্রভূত ক্ষতি হয়।

এ সব ব্যর্থতার পরও ব্র্যাকের উন্নয়ন তৎপরতা ও উদ্যোগ থেমে থাকেনি। ১৯৮৮ সালে চালু করা হয় সঞ্চয়ী পাশ বুক পদ্ধতি। ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণের সুবিধাও চালু করা হয়।

---

[7] Summary of the RED research report entitled "The impact of BRAC's Rural Development Programme in Gilanda village, Manikganj" by Mick Howes, et. al., 1993 November, 19p. (Summarized in Bangla by KE Kabir).

এ ধরনের তৎপরতা শুরু হতে না হতেই আবারও ব্যাপক আকারে বন্যার কবলে পড়ে সদস্যরা সর্বস্ব হারায়। ব্র্যাক আবারও আর্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। খাদ্য ও গৃহায়নের ব্যবস্থা করে।

পরবর্তী বছর সঞ্চয়ী গ্রুপ ব্যাংক প্রক্রিয়া চালু করা হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বিশেষ দুর্নীতিপরায়ন গ্রুপে নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আবারও স্বার্থান্বেষী গ্রুপ অর্থ আত্মসাৎ করে।

বাহিরখোলা গ্রাম সংগঠন গড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব গিলণ্ডা (শ্রমজীবী – গ্রাম সংগঠন গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে তানজুমান নামের এক মহিলার সক্রিয় উদ্যোগই ছিল সবিশেষ প্রশংসনীয়। অবশ্য প্রথম দিকে গ্রামবাসীরা তানজুমানের তৎপরতায় সাড়া দেয়নি। তানজুমানের দৃঢ় প্রত্যয়ের কাছে অবশেষে তারা হার মানে। তানজুমান নতুন গ্রুপের নেত্রী নির্বাচিত হন এবং এই সংগঠনে উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ভিজিডি কার্ডধারীদের জন্য প্রাপ্ত গম থেকে প্রতিবারই ৫ কেজি করে গম সে টোল হিসেবে নিতে থকে। এ বছরই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে ভোট দেয়ার বিনিময়ে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম দেবে বলে তিনি যে গম তোলেন তাও তানজুমান আত্মাসাৎ করেন। অবৈধ গর্ভপাত করিয়ে বিপুল অংকের অর্থ তিনি কামিয়ে নেন। আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনে দু'জনকে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের কাঝ থেকেও তানজুমান ৬০ টাকা করে ঘুষ খান।

এতে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয় এবং ১৯৮৩ সালে নতুন এক তরুণীকে পূর্ব গিলণ্ডা গ্রাম সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর থেকেই গ্রুপের সদস্যদের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়।

গিলণ্ডা গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় ১৯৮০ সালে গ্রাম সংগঠন হয়। সদস্যরা সপ্তাহে ৫০ পয়সা থেকে ১ টাকা সঞ্চয়ী তহবিলে জমা করতে থাকে। এদের উলেøখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। অনেক সদস্যকে হাঁস-মারগী পালনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে স্বাস্থ্য সেবিকা ও দাই-এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চারজনকে কাজের জন্য মানিকগঞ্জে আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশনে পাঠানো হয়। সদস্যদের সঞ্চিত টাকা কৃষি ব্যাংকে জমা রাখা হয়। বেশ কিছু সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহ নির্মাণ ও গবাদি পশু পালনের জন্য ব্যক্তিগত ঋণ নেয়। কিন্তু ১৯৮৮ সালের বন্যায় আবার পিছিয়ে পড়তে হয়। তিন মাস তৎপরতা বন্ধ থাকে। ব্র্যাক পশ্চিম পাড়ায়ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। এতে সদস্যরা দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের একজন মেম্বার পদ প্রার্থী ভোটের জন্য ৩ হাজার টাকা দিতে চাইলে সদস্যরা তা প্রত্যাখান করে। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যই এ রকম আচরণ করা সম্ভব হয়। ১৯৯২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সম্মিলিতভাবে তাদের নিজস্ব পছন্দই প্রার্থীর জন্য তারা কাজ করে।

গত ৫/৬ বছরে আরও ইতিবাচক উন্নয়ন সূচিত হয়েছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। জীবন বীমাও চালু করা হয়েছ। তাছাড়া খোলা হয়েছে কাঁথা সেলাই কেন্দ্র।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বস্থ্য সেবিকাদের আয় বেশ ভাল। বিশেষ করে ফাল্গুন মাস থেকে আষাঢ় পর্যন্ত। এ সময় রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে।

শাক-সবজি থেকে আয় আসে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। কিন্তু অল্প বিস্তর সারা বছরই থাকে। সন্তান প্রসব করানো থেকে দাত্রীদের আয় সর্বোচ্চ আসে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে। এ সব তৎপরতায় ব্র্যাকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের বিরাট অবদান রয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের আয় বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিবমাণ ঘটেনি বলেই মনে হয়।

সদস্যদের তালিকা থেকে দেখা গেছে যে, ভূমিহীন দরিদ্র মানুষই গ্রাম সংগঠনে সংগঠিত হয়েছে। যাদের জমি ১.৫ একরের বেশি তারা কদাচিত গ্রাম সংগঠনের যুক্ত হয়।

সদস্যদের তালিকা থেকে দেখা গেছে যে, ভূমিহীন দরিদ্র মানুষই গ্রাম সংগঠনে সংগঠিত হয়েছে। যাদের জমি ১.৫ একরের বেশি তারা কদাচিত গ্রাম সংগঠনের যুক্ত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে সাংগঠনিক অদক্ষতা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনসমূহের কর্মতৎপরতা বাধাগ্রস্ত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

গিলণ্ডা পূর্ব পাড়ার গ্রুপের সদস্যরা নিজস্ব প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। এটা উন্নয়ন কর্মতৎপরতারই ফল। ব্র্যাকের উন্নয়ন তৎপরতার ফলে গিলণ্ডা গ্রামের মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া তারা ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শাক-সবজির চাষ করছে এবং ছোট ছোট ব্যবসায় পরিচালনা করার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের আত্মবিকাশের সুযোগ ও কর্মতৎপরতার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। কাঁথা সেলাই কেন্দ্র সুযোগকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পলী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব[৮]

শাহ্ আসাদ আহমেদ, ইশরাত আরা, পবিত্র কুমার বসু, মোঃ আলতাফ হোসাইন, কামরুল হুদা, সারোয়ার জাহান, মোস্তফা কামাল, আজমল কবির কাজল ও মালিহা মঈদ

ভূমিকা

মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পলী উন্নয়ন কর্মসূচির (আরডিপি) প্রভাব দেখার জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়। তারই ফলাফল এই প্রতিবেদনে পেশ করা হয়। 'পিআরএ' পদ্ধতি ব্যবহার করে আড়াই দিন ব্যাপী এই সমীক্ষাটি চালানো হয়। 'পিআরএ' পদ্ধতি ব্যবহার করে আড়াই দিন ব্যাপী এই সমীক্ষাটি চালানো হয়। 'পিআরএ' বা Participatory Rural Appraisal হল একটি উন্নয়নমূলক এ্যাপ্রোচ। যাতে কোন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কোন প্রকল্পে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রকল্প বিষয়ক সকল স্তরে গ্রামীণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। এই পদ্ধতি গবেষণায়ও সফলভাবে ব্যবহার করা যায়।

এই গ্রাম ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের অদূরে উত্তর দিকে এবং মানিকগঞ্জ শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। সত্তর দশকের শেষের দিকেও এই গ্রামে মাত্র একটি নিচু কাঁচা রাস্তা ছিল। এই রাস্তা প্রায় দুই মাসেই থাকত পানির নিচে। গ্রামের মানুষদের স্কুল, মাদ্রাসা, হাসপাতাল কিংবা অফিসে পৌঁছতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হত। এই গ্রামে কোন মসজিদ ছিল না। বিশুদ্ধ পানির জন্য মাত্র ২টি নলকূপ ছিল। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও সেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৭৬ সারে গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড শুধু করার পূর্বে এ গ্রামে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। ধনী লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যাদের নিজেদের শুধুমাত্র খোরাকের জন্য কিছু পরিমাণ জমি আছে এমন লোকের সংখ্যা ধনী লোকের সংখ্যার চেয়ে একটু বেশি। একটি অংশ দিনমজুর হিসাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। চাষাবাদের জমি অল্প সংখ্যক পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই দরিদ্রগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে শোষিত হত। বিচার সালিসে দরিদ্রদের অংশগ্রহণের কিংবা তাদের মহামতা প্রকাশের কোন সুযোগ ছিল না।

১৯৭৬ থেকে ব্র্যাক ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকাণ্ড

১৯৭৬ সালে এ গ্রামে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী ডাকুরিয়া এলাকায় একটি দল গঠন করা হয়, সেখানে গুর্কির লোকেরা পরে যোগদান করতে পেরেছে। তখন পুরুষ ও মহিলাদের একই দলের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। ব্র্যাক প্রথমেই এ সকল সদস্যদেরকে তাদের গ্রামের সেই একমাত্র ভাঙ্গা রাস্তাটি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির যোগান দেয় এবং রাস্তার দু'ধারে লাগানোর জন্য চারা গাছ দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে সদস্যদেরকে জমি লীজ নিয়ে পুকুর কেটে মাছ চাষের জন্য সাহায্য

[৮] Summary of the RED research report entitled "The impact of BRAC's Rural Development Programme in Gurki Village, Manikganj" by Shah Asad Ahmed, et. al., 1993 October, 35p (Summarized in Bangla by Montakhabul Anam Khan)

প্রদান করতে থাকে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সথে সাথে দলের সদস্যদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলে নারী ও পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন দল গঠিত হয়।

সদ্য গঠিত পুরুষ দলের সদস্যদের একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষে প্রয়োজনীয় আইন জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ছোট ব্যবসা কিংবা গরু পালনের জন্য ঋণ দেয়া হয়। বিশুদ্ধ পানি পানের বিশ্চয়তা বিধানের জন্য পূর্বে ব্র্যাকের ঋণ দিয়ে অগভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু হলেও সদস্যরা এক পর্যায়ে এ কাজ বাতিল করে দেয়।

মহিলা সংগঠন গঠনের পরপরই ১০ জন মহিলাকে রেশম চাষের উপর সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু কাজ শুরুর সাথে সাথে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, তুঁত গাছ লাগানোর পর দেখা যায়, এ জায়গার মাটি এই গাছ চাষের অনুপযুক্ত ফলে এর চাষ ভাল হয় না। এভাবে ধীরে ধীরে রেশম চাষ বন্ধ করে দিতে হয়। পরে ব্র্যাক মুরগীর বাচ্চা পালনের জন্য সাহায্য করতে লাগল। কিন্ত এখানে অনিয়মিত বদ্যুিৎ সরবরাহের জন্য এ কর্মকাণ্ডও বাধাগ্রস্ত হয়।

এরপরে দলের সভানেত্রীর বাড়িতে এমব্রয়ডারী সেন্টার খোলা হয়। ধীরে ধীরে গ্রামে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সদস্যাগণ এটাকে একটি নিয়মিত আয় উৎপাদক কাজ হিসাবে ধরে নেয়। কিন্তু দেখা গেল, নেত্রী তার নিজের স্বার্থে কেন্দ্রের সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে এবং জিনিসপত্রের অপব্যবহার করে। আরো দেখা গেছে, নেত্রীর পক্ষের সদস্যরা সুযোগ-সুবিধা বেশি পায় ও অন্যান্যরা সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

সদস্যরা পরবর্তীতে একটি ভিন্ন এমব্রয়ডারী কেন্দ্র খোলার জন্য ব্র্যাককে অনুরোধ করে এবং ব্র্যাক তা মেনে নেয়। সদস্যরা পার্শ্ববর্তী আয়েশা আবেদ ফাউণ্ডেশন থেকে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করে।

এছাড়াও ব্র্যাক বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন করে এবং দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে। এ এলাকায় ব্র্যাকের সাথে সাথে বিআরডিবি, কেয়ার ও গ্রামীণ ব্যাংকও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হাতে নেয়।

আরডিপি'র প্রভাব

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যপদ ও চলতি ঋণ পাওয়ার সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, সংগঠনের সদস্যরা তুলনামূলকভাবে ভাল আছেন। গ্রাম সংগঠনের এক সদস্যা, যিনি ১৯৮০ সালে সংগঠনে যোগ দেন, জানান এ সংগঠনে যোগ দেয়ার পরে তার পুষ্টির মান কিভাবে পরিবর্তণ হয়েছে। দেখা গেছে, ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যে চালের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মাছ ও তরকারি যথেষ্ট পরিমোণে খায়। তরকাররি বেশি খায় পৌষ ও মাঘ মাসে। ডালের ব্যবহারও বেড়েছে।

আনোয়ার ও মহেলা দম্পতির দুর্বিসহ জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে ব্র্যাকে। আনোয়ারের যে সম্পত্তি ছিল তা তার বোনের বিয়ের যৌতুকের জন্য বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে মহেলা নামের এক

পরিশ্রমী রমণীকে বিয়ে করার পর তাদের জীবনের মোড় ঘুড়ে যায়। ওরা দু'জনই ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্য। মহেলা এমব্রয়ডারী সেন্টারে কাজ করে নিয়মিত একটি আয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আনোয়ার ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়েছে এবং ইতিমধ্যে পরিশোধও করেছে। গত বছর ঐ টাকার আয় দিয়ে ছোট ভাইকে বিদেশে পাঠিয়েছে। ছোট ছেলের মৃত্যুতে মিলাদে অনেক পয়সা খরচ করেছে।

গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পূর্বে মহিলাদের চলাফেরা ছিল বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে। তাদের সম্পূর্ণ আর্থিক নির্ভরশীলতা ছিল পুরুষদের উপর। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিস্থিতি নেই। বাড়ির বাইরেই আয়মূলক কাজে তারা অংশগ্রহণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। এ এমব্রয়ডারী কেন্দ্রই এখন মহিলাদের কর্মস্পৃহা ও যোগ্যতাকে প্রমাণ করে।

উপসংহার

এ স্বল্প পরিসরের গবেষণায় আরডিপি'র প্রভাব সংক্রান্ত কোন স্বতঃসিদ্ধ উপসংহারে উপনীত হওয়া কঠিন। তবুও দেখা যায়, গ্রামীণ জীবনে অর্থনৈতিক চরম অসমতা বিরাজমান। যার ফলে দারিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাক বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতেও কতিপয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি, অবহেলিত নারীগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রবিতন্ধকতা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া ও এজন্য কতিপয় স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণই হল আরডিপি'র বড় সফলতা।

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন-দক্ষতার জ্ঞানের উপর কয়েকটি বাছাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাবঃ একটি বহুমুখী বিশেষণ[৯]

সমীর রঞ্জন নাথ, মোঃ মহসিন ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন-যাপন করতে হলে দৈনন্দিন জীবনের উপর কতগুলো ন্যুনতম দক্ষতা (Life skills) অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। এ দক্ষতা মানসিক ও সামাজিক। মানসিক দক্ষতার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান। সামাজিক দক্ষতাগুলোর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা, জেদ ও আবেগের সাথে খাপ খাওয়ানো ও সম্পর্ক স্থাপন। এসব দক্ষতা একজন ব্যক্তির মনোজগৎ, সমষ্টিগত বিকাশ ও সহৃদয়তার উপর নির্ভরশীল। এসব দক্ষতা অর্জন করতে পারলে জনসাধারণ তাদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

এসব দক্ষতা ছেলে-মেয়েদের শুধু বর্তমান সময়ের জন্যই নয়, ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তি হিসাবে, পরিবারের সদস্য হিসাবে ও একজন নাগরিক হিসাবেও তার কাজে লাগবে। সম্প্রতি সমাজের সাক্ষরতার অগ্রগতি অথবা শিক্ষাগত সাফল্যের পরিমাপের জন্য এসব জীবন দক্ষতাকে আবশ্যিক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয়, যে কেউ তার নিজস্ব সমাজ থেকে জীবন-দক্ষতার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ছেলে-মেয়েদের জীবন-দক্ষতার জ্ঞানের সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ ব্যাপারে গবেষণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ব্র্যাকের অন্য একটি গবেষণায় দেশব্যাপী ১১-১২ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের উপর একটি জরিপের মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জরিপের বিশেষণকে চার ভাগে করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পড়া, লেখা, অংক ও জীবন-দক্ষতার জ্ঞান। বর্তমান নিবন্ধে শুধু জীবন-দক্ষতার অংশটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

গবেষণা পদ্ধতি

ছেলে-মেয়েদের জীবন-দক্ষতা নির্ণয়ের জন্য নিচের ২০টি প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছিল ঃ

১) পাতলা পায়খানার ভাল ও সহজ চিকিৎসা কী?
২) কোন খাদ্য রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে?
৩) কিভাবে পানি পান করার যোগ্য করা যায়?
৪) কোন পানি পান করা উচিত?
৫) কোথায় মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত?
৬) টিকা দিলে শিশুদের কী উপকার হয়?
৭) একটি পরিবারে কতজন ভাই ও বোন থাকা উচিত?

[9] Summary of the RED research report entitled "Influence of selected socioeconomic factors on life skills knowledge of children in Bangladesh: multivariate nanalysis" by SR Nath, Md. Mohsin and AMR Chowdhury, 1993 December, 19p. (Summarized in Bangla by KE Kabir).

৮)	মেয়েদের স্কুলে যাওয়া উচিত কি না?
৯)	হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুকে রোগের আক্রমণ থেকে কী দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়?
১০)	যদি কারো অত্যন্ত বেশি জ্বর ওঠে তাহলে প্রাথমিকভাবে কী করা উচিত?

উত্তর 'ঠিক' অথবা 'ঠিক নয়' – এ অনুসারে দক্ষতা নির্ণয় করা হয়েছে। 'জানিনা' উত্তরকে ঠিক নয় ধরা হয়েছে। উপরোক্ত সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তরে '১ জন কিংবা ২ জন' এবং ৮ নং প্রশ্নের 'হ্যাঁ' উত্তরকে ঠিক বলে ধরা হয়েছে।

পাঁচটি স্তরে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে চারটি গ্রামীণ এলাকায় এবং একটি শহরাঞ্চলে। এ সমীক্ষায় মোট ২,১০০ ছেলে-মেয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্রে শতকরা ৭২.৬ ভাগ ছিল পাঠরকম, ১০.৫ ভাগ পড়াশুনা বাদ দেয়া এবং ১৬.৯ ভাগ কখনো স্কুলে যায়নি।

গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মায়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ছিল নিরক্ষর, ২৭.৭ ভাগ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে এবং কেবলমাত্র ১.১ ভাগ মায়েরা ১০ম শ্রেণী বা ততোধিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। অপরদিকে, শহরাঞ্চলে শতকরা ১০.৭ ভাগ মা ১০ম শ্রেণী বা ততোধিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। দেখা গেছে, গ্রামের পিতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪১ ভাগ নিরক্ষর, অপর দিকে শহরের পিতাদের ২৯.৫ ভাগ নিরক্ষর। গ্রাম ও শহর এলাকার মায়েদের চেয়ে পিতাদের শিক্ষার হার বেশি।

গবেষণাধীন গ্রামগুলির প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছেলে-মেয়ে ছিল মূলতঃ এমন সব পরিবারের যাদের চাষযোগ্য জমি নেই। অর্ধেকেরও কম সংখ্যক পরিবারের নিজস্ব বসতবাড়ি রয়েছে। আরও দেখা গেছে, এক তৃতীয়াংশেরও বেশি ছেলে-মেয়ের পরিবারে মাসিক আয় দু'হাজার টাকারও কম।

এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলের পরিবারের শতকরা মাত্র ১২.৫ ভাগের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, শহরে এ হার ৭২.৪ ভাগ। সব মিলে গড়ে ২৪.৫ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে।

ফলাফল ও আলোচনা

ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, গ্রামের চেয়ে শহরের ছেলে-মেয়েরা আনুপাতিক হারে ভাল করেছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ছেলে-মেয়েদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই পানীয় জল ও মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নে সঠিক উত্তর দিয়েছে। অপরদিকে, 'উচ্চ তাপমাত্রার জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কী করা উচিত' এবং 'কী খাদ্য রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে' এ প্রশ্ন দু'টোর সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে যথাক্রমে শতকরা ৪০.১ ও ৩৩ ভাগ ছেলে-মেয়ে।

ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে জীবন-দক্ষতা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। মেয়েরা কয়েকটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে ভাল করেছে। গ্রাম কিংবা শহরের সকল মেয়েই পাতলা পায়খানার সহজ

চিকিৎসার বিষয়টি ভাল জানে। অনুরূপভাবে তারা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও ভাল জানে। তাছাড়া পরিবারের আকার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যতই উপরের শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই তারা জীবন-দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাতকানা রোগ প্রতিরোধ, টিকার উপকারিতা ও আদর্শ পরিবারের অকার এ তিনটি বিষয়ের উপর জ্ঞান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ধাপ বাড়ার সাথে বেড়ে যায়। অপর এক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রামের ছেলে-মেয়েরা পিতার শিক্ষা দ্বারা পানি বিশুদ্ধকরণ ও টিকা দেয়ার উপকারিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রভাবিত হয়।

তবে পারিবারিক জমির পরিমাণ কোন অবস্থাতেই কোন জীবন-দক্ষতা জ্ঞানের উপর প্রভাব ফেলে না। ছেলে-মেয়েদের জীবন-দক্ষতা জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ১১-১২ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরা এসব দক্ষতা সমানভাবে অর্জন করতে পারছে না। কতগুলো আর্থ-সামাজিক বিষয় এ জ্ঞান অর্জনে প্রভাব বিস্তার করছে।

দেখা যায়, যতই উপরের ক্লাসে ওঠে ততই ছেলে-মেয়েরা এসব দক্ষতা অর্জন করে। সুতরাং এ সমীক্ষার ফলাফল থেকে বলা যায়, সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন-যাপনের দক্ষতা অর্জনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বেশ কিছু জীবন-দক্ষতার জ্ঞান অর্জনে মা-বাবার শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। জীবন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শহরের ছেলে-মেয়েরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভাল করেছে। বর্তমানের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এমন হতে পারে। এটা বাস্তব সত্য যে, বেশির ভাগ শিক্ষা উপকরণই ব্যয় করা হয় শহরের ছেলে-মেয়েদের জন্য। এ অবস্থাপর পরিবর্তন প্রয়োজন।

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে দেয়?[১০]

মোঃ কায়সার আলী খান ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাক দু'ধরনের স্কুল চালু করে। আট থেকে দশ বছর বয়সী যেসব শিশু কখনো কোন সরকাররি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়নি, বা ভর্তি হলেও শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে স্কুল পরিত্যাগ করেছে, তাদের জন্য তিন বছর মেয়াদি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল (এনএফপিই) ১৯৮৪ সালে চালু করা হয়। আর যাদের বয়স ১১-১৬ বছর তাদের জন্য দু'বছর মেয়াদি স্কুল (পিইওসি) চালু করা হয় ১৯৮৮ সালে (১৯৯২ থেকে ৩ বছর মেয়াদী করা হয়েছে)।

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো শিক্ষা লাভের জন্য সরকার অনুমোদিত আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হয়। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিচালিত অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হলেও দু'বছরের মধ্যেই তার ৫৬% পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। পড়াশুনা শেষ না করেই কেন স্কুল ত্যাগ করে তার কারণ উদঘাটন করার জন্য এ গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়।

এ লক্ষ্যে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এনএফপিই এলাকাগুলো থেকে দু'টি এলাকা (মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী) বেছে নেয়। এলাকা দু'টিতে প্রায় পাঁচ বছর থেকে এনএফপিই কর্মসূচি চালু ছিল। এ দু'টি এলাকার প্রত্যেকটি থেকে ১১৬ জন তথ্যপ্রদানকারী বাছাই করা হয়। এদের মধ্যে ছিল শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে স্কুল পরিত্যাগ করা ছাত্র-ছাত্রী, এখনো পড়াশুনা করে এমন ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের মাতা-পিতা এছাড়া তথ্য সংগ্রহের জন্য এনএফপিই শিক্ষক, কর্মসূচি সংগঠক এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষকদেরও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই অশিক্ষিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিার থেকে এসেছে। মা-বাবা শিক্ষার গুণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ ও অবহিত নয়। তারা বাড়িতে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ সহায়তা দিতে পারে না। এসব পরিবারের অধিকাংশ শিশুদেরই বাড়িতে বা মাঠে-ঘাটে তাদের মা-বাবার কাজে সাহায্য করতে হয়। কোন কোন শিশুকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়।

গবেষণায় আরেকটি কারন দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমকি স্কুলে ভর্তি হতে এককালীন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা ভর্তি ফি, বইপত্র ক্রয়, স্কুলের পোষাক, অন্যান্য চাঁদা যেমন বার্ষিক ক্রীড়া, মিলাদ, ইত্যাদি

[10] Summary of the REd research report entitled "Identifying the reasons for dropout of former NFPE students in formal school" by Md Kaisar A Khan and AMR Chowdhury, 1993, 24p, (Summarized inBangla by Md Maswoodur Rahman)

বাবদ দিতে হয়। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের মা-বাবার পক্ষে শিক্ষার জন্য এক সঙ্গে এত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

গবেষণায় আরো দেখা যায়, মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া এবং মেয়েদের শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দেয়াই মেয়েদের স্কুল পরিত্যাগের একটি কারণ। কিছুসংখ্যাক মা-বাবা তাদের উঠতি বয়সের মেয়েদের স্কুলে পাঠানো নিরাপদ মনে করে না। তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে, যেকোন সময় তাদের মেয়ে বখাটে ছেলেদের হাতে পড়তে পারে, এবং মেয়ের নামে বদনাম ছড়াতে পারে, বখাটে ছেলেদের প্রেমে পড়তে পারে, এমনকি ধর্ষিতাও হতে পারে। তাছাড়া, মা-বাবা ভাবে যেহেতু বিয়ের পরে মেয়েরা শ্বশুড় বাড়ি চলে যাবে, কাজেই তাদের বেশি শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

সর্বোপরি এ গবেষণা ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ করার অন্য একটি গুরুত্ববহ কারণ চিহ্নিত করেছে, এবং তা হচ্ছে একটি পদ্ধতিগত চলক (Systemic variable)। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের নেয়া হয়, তাদের বেশির ভাগই এনএফপিই স্কুলের পূর্বে অন্য কোন স্কুলে ভর্তি হয়নি। তারা ব্র্যাকের নির্ধারিত শিক্ষা পদ্ধতিতে লেখা-পড়ায় অভ্যস্ত। আনুষ্ঠানিক স্কুরে শিক্ষার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তা ব্র্যাক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে ব্রাক স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক স্কুলে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। ফলে তারা পড়াশুনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এ গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ত্যাগ করার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে মা-বাবার দরিদ্র আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার অতিরিক্ত ব্যয়। এনএফপিই স্কুলের জীবন সম্পৃক্ত শিক্ষা, পড়াশুনার বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রম, মা-বাবার সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা, পড়াশুনার ব্যাপারে নিয়মিত কর্তৃপক্ষীয় তদারকি এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপস্থিতির ব্যাপারে যথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি স্কুল ত্যাগ করা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরত রাখতে পারে।

এনএফপিই বা উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে যারা মাধ্যামিক স্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে যায়, দেখা গেছে তাদের মা-বাবারা শিক্ষার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং তাদের বেশির ভাগেরই আর্থিক অবস্থা মোপামুটি ভালো। তাছাড়া, এনএফপিই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে যেসব শিশু প্রথম বয়সে যেকোন ধরনের আনুষ্ঠানিক স্কুলে একবার পড়াশুনা করেছে, গবেষণায় তাদের অধিকাংশকে এখনো মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে দেখা যায়।

উপসংহারে বলা যায়, পারিবারিক ঐতিহ্য, স্বচ্ছল আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ এবং মা-বাবার একান্ত অনুরাগ ও আগ্রহই এনএফপিই স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের উপর একটি মূল্যায়ন[১১]

আহমেদ আলী, ফজলুল করিম, শাহ নূর মাহমুদ ও নজরুল ইসলাম

রক্তশূন্যতা বাংলাদেশের গ্রামীন মহিলাদের একটি সাধারণ সমস্যা। প্রায় প্রত্যেক মহিলাই কোন না কোন সময়ে রক্তশূন্যতায় ভুগে থাকে। এ ছাড়া গ্রামের গর্ভবতী মহিলাদের শতকরা ৪৭ ভাগই রক্তশূন্যতায় ভোগে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরপরই ব্র্যাক গ্রামীণ মানুষের ব্যাপক উন্নয়নের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। বেশ কিছু প্রকল্পের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে ব্র্যাক ১৯৯১ সালে মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসূচি এলাকাভুক্ত গ্রামসমূহের গর্ভবতী মহিলাদের রক্তশূন্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে গর্ভধারণের ৬ষ্ঠ মাস থেকে প্রসবের ৪২ দিন পর পর্যন্ত আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা মাসে ৬০টি করে ট্যাবলেট পাচ্ছে।

আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সরবরাহ এবং নিয়মিত সেবনের উপর রক্তশূন্যতা প্রতিরোধের সফলতা নির্ভর করে। তাই গর্ভবতী মহিলাদেরকে ট্যাবলেট সরবরাহের পাশাপাশি এ ট্যাবলেট নিয়মিত সেবনের উপর জোর দিতে হবে। তা না হলে গর্ভকালীন সময়ে রক্তশূন্যতার প্রকোপ কমানো কঠিন হবে।

এ কারণেই আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ এবং গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত সেবনের[12] বিষয়টির মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জুন-জুলাই মাসে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত দশটি থানার ২৪৬ জন গর্ভবতী মহিলার ট্যাবলেট সেবনের উপর একটি জরিপ করে। এ দশটি থানা হলো ত্রিশাল, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, বগুড়া সদস, কাহালু, গোবিন্দগঞ্জ, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী।

জরিপে দেখা যায়, গড়ে শতকরা ২৯ ভাগ গর্ভবতী মহিলা নিয়মিত আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবন করেন। অঞ্চল ভেগে এ সংখ্যার হেরফের দেখা যায়; এ সংখ্যার হেরফের দেখা যায়; এ সংখ্যা

[11] Summary of the RED research report entitled "Assessment onthe regularity of iron-folic acid tablet intake" by Ahmed Ali et. al., 1993 March, 16p (Summarized in Bangla by KE Kabir).

[12] নিয়মিত ট্যাবলেট সেবনঃ যদি কোন গর্ভবতী মহিলা ট্যাবলেট প্রাপ্তির দিন থেকে প্রতিদিন দুটো করে ট্যাবলেট কোন দিন বিরতি না দিয়ে সেবন করে তাকে নিয়মিত সেবনকারীনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অনিয়মিত ট্যাবলেট সেবনঃ যদি কোন গর্ভবতী মহিলা ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একদিন ট্যাবলেট সেবন না করে তাকে অনিয়মিত সেবনকারীনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কখনোই ট্যাবলেট সেবন করেনিঃ যদি কোন গর্ভবতী মহিলা ট্যাবলেট পাওয়ার পর কোন ট্যাবলেটই গ্রহণ না করে তবে সে কখনোই ট্যাবলেট সেবন করেনি বলে ধরা হয়েছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে সর্বোচ্চ শতকরা ৩৭ ভাগ, বগুড়া অঞ্চলে ৩০ ভাগ এবং দিনাজপুর অঞ্চলে সর্বনিম্ন শতকরা ১৮ ভাগ। শতকরা প্রায় ৪ ভাগ মহিলা মোটেই ট্যাবলেট সেবন করেননি।

সাধারণত: পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে মহিলারা ট্যাবলেট সেবনে অনিয়ম করে থাকেন। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অম্লাধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধতাসহ কালো পায়খানা এবং উদরাময়। খাওয়ার পরপরই ট্যাবলেট সেবন করলে এবং প্রচুর পানি পান করলে অম্লাধিক্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতা হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়াও মহিলাদের ট্যাবলেট সেবন করার সময় সম্পর্কে অসচেতনতাও নিয়মিত ট্যাবলেট সেবন না করার কারণ হতে পারে। এ বিষয় দু'টি ট্যাবলেট বিতরণের সময় মহিলাদের বুঝিয়ে বলে দিতে হবে।

রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ ঘন ঘন সন্তান প্রসব, অর্থনৈতিক দূরবস্থা, কৃমির আক্রমণ এবং বৈষম্যমূলক খাদ্য বন্টন বা গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্যের ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়া। রক্তশূন্যতায় রক্তের লোহিত কণিকার ঘাটতি দেখা দেয়। শরীরে লোহিত কণিকা বৃদ্ধির জন্য শুধু আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট খেলেই চলবে না, এর সাথে আমিষ জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন সি, দস্তা এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে। কৃমি দূর করাও আবশ্যক। তাই রক্তশূন্যতা দূরীকরণে সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ট্যাবলেট নিয়মিত সরবরাহের পাশাপাশি সেগুলো সেবন করল কিনা তার খোঁজ নিতে হবে। সর্বোপরি, রক্তশূন্যতা গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুর জন্য কতটা ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ, তা বোঝানোর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

দেখা গেছে, রক্তশূন্যতার সাথে অপুষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট নিয়মিত সেবনের পাশাপাশি পুষ্টিও নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ব্র্যাক কর্মসূচির আওতাভুক্ত গর্ভবতী ও প্রসূতিদের মধ্যে ট্যাবলেট বিতরণ করে এবং ট্যাবলেট সেবন করা হলো কিনা তার খোঁজ নেয়। ব্র্যাক কর্মীরা গর্ভবতী মহিলাদের এ ট্যাবলেট সেবন করার ব্যাপারে সচেতন করে তোলার দায়িত্বও পুরোপুরিভাবে পালন করে। এ ছাড়াও সামগ্রিক পুষ্টির ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে। তার জন্য ক্রয়ক্ষমতা তথা উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাকের আলাদা কর্মসূচিও রয়েছে।

জরিপ থেকে একটি সত্য বেরিয়ে এসেছে এবং তা হলো ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মা-বোনদের রক্তশূন্যতা ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

গর্ভবতী মহিলাদের সেবা প্রদানে ব্র্যাকের ভূমিকা[১৩]

আহমেদ আলী, ফজলুল করিম, শাহ নূর মাহমুদ ও নজরুল ইসলাম

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও গর্ভকালীন বা প্রসবকালীন সময়ে অনেক মহিলা মারা যায়। এ ছাড়াও প্রসবের পর নানা ধরনের জটিলতার কারণেও বহু মায়ের মৃত্যু ঘটে। মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যম যেখানে সরকারি স্যাটেলাইট ক্লিনিক নেই সে সকল গ্রামে কর্মসূচির আওতায় গ্রামভিত্তিক প্রসব-পূর্ব কেন্দ্রের (Ante-natal care centre) মাধ্যমে গ্রামীণ মায়েদের প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা ব্র্যাক করেছে।

১৯৯২ সালের জুন থেকে আগষ্ট পর্যন্ত যে সকল গর্ভবতী মহিলা এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে সেবা গ্রহণের জন্য এসেছিল তাদের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এ সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল গর্ভবতী মহিলারা তাদের গর্ভকালীন সময়ের কোন পর্যায়ে এ সেবা কেন্দ্রে আসার হার বাড়ে কি না এবং তাদের সাথে ধাত্রীদের যোগাযোগের হার কেমন তা দেখাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

ময়মনসিংহ, বগুড়া এবং দিনাজপুর অঞ্চলের মোট ২৯৩ জন গর্ভবতী মহিলার উপর এ সমীক্ষা চালানো হয়। এসব মহিলা গর্ভধারনের ৪ থেকে ৯ মাসের মধ্যে প্রসব-পূর্ব সেবা কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগই (৬৯%) গর্ভধারণের ৪-৬ মাসে মধ্যে সেবা কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত হয়েছিল – যার কারণে তারা প্রাক-প্রসবকালীন পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রে আসার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল।

গর্ভাবস্থার এ সময়ে (৪-৬ মাস) তালিকাভুক্ত হওয়ার ঘটনা দিনাজপুর অঞ্চলে সব চেয়ে বেশি (৮০%) এবং ময়সনসিংহ অঞ্চলে সব চেয়ে কম (৫৩.১%) দেখা যায়। যে সকল মহিলা বর্তমানে ৯ মাসের গর্ভবতী তাদের মধ্যে যারা গর্ভাবস্থার ৫-৬ মাসের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তারা এ সকল সেবা কেন্দ্রে গড়ে ৩ বার প্রাক-প্রসবকালীন পরীক্ষা করাতে এসেছিল। যারা গর্ভাবস্থার ৭ম মাসে তালিকাভুক্ত হয়েছে তারা কেন্দ্রে গড়ে ২.২ বার আসতে পেরেছে। আর যারা ৮ম মাসে তালিকাভুক্ত হয়েছিল তারা মাত্র গড়ে ১.৩ বার কেন্দ্রে এসেছে। এ ধারা ধাত্রীদের সংগে গর্ভবতী মহিলাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। গর্ভবতী মহিলাদের যারা গর্ভাবস্থার ৫ম মাসে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদের সাথে ধাত্রীদের যোগাযোগ গড়ে ৩.৮ বার, ৬ষ্ঠ মাসে যারা তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে গড়ে ৪.০ বার, ৭ম মাসেরস্ক্ষত্রে গড়ে ২.৮ বার এবং ৮ম মাসের ক্ষেত্র গড়ে ২.৫ বার যোগাযোগ হয়েছে।

এ সমীক্ষার ফলাফল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে সেবা কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত হলে প্রাক-প্রসবকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট সময় থাতে থাকে। গর্ভবাস্থার ৬ মাস হওয়ার আগেই তালিকাভুক্ত হওয়া কাম্য। গর্ভাবস্থার ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে প্রাক-প্রসবকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিচর্যা নিরাপদ প্রসবের জন্য খুবই দরকারী। গর্ভাবস্থার প্রথম প্রান্তিকটাও খুবই জরুরী। এ

[13] Summary of the RED research report entitled "Does early enrolment of pregnant women with ante-natal care centres increase their visits todifferent ante-natal service sources?" By Ahmed Ali, et. al. 1993 June, 19p, (Summarized in Bangla by Montakhabul Anam Khan)

প্রান্তিকে বেশিরভাগ গর্ভপাত স্বতস্ফুর্তভাবে (Spontaneous abortion) হয়ে থাকে। তাই এ প্রান্তিকে মহিলাদের তালিকাভুক্ত হওয়া এবং প্রাক-প্রসব পরিচর্যা শুরু করা খুবই দরকারী।

তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থার আরও উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়া দরকারঃ

১) গভবতী মহিলাদের চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে তালিকাভুক্ত করার জন্য কর্মসূচি সংগঠক, স্বাস্থ্য সেবিকা ও ধাত্রীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া। গ্রাম সভা, মহিলা সভা ও অন্যান্য ক্যাডারদের আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা।

২) বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা গর্ভবতী, মহিলাদের গর্ভধারণের প্রথম প্রান্তিক থেকেই কেন্দ্রে যাতায়াত এবং ধাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে।

৩) ধাত্রীদের নিয়মিতভাবে গর্ভবতী মহিলাদের সাথে যোগাযোগ উৎসাহিত করতে হবে এবং গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা উপদেশ দেবে। এভাবে ধাত্রীর গর্ভবতী মহিলাদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এবং প্রসব-পূর্ব পরিচর্যা উন্নত এবং নিরাপদ প্রসব সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।

সন্তান প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা[১৪]

এলিজাবেথ এ গুডবার্ণ, রুখসানা গাজী ও মোশ্‌তাক চৌধুরী

বিশ্বের যে সব দেশে প্রসূতি মৃত্যুর হার খুব বেশি, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। গর্ভধারণ সংক্রান্ত সমস্যার কারণ আমাদের দেশে অনেক মেয়েই অল্প বয়সে মারা যায়। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রসবজনিত প্রতিটি মৃত্যুর কারণের সাথে আরো অন্যান্য অসুস্থতাও জড়িত থাকেতে পারে, যেগুলোর জন্য হয়ত মায়ের সরাসরি মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু এ সমস্ত অসুস্থ্যতা তার স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁায়। যেহেতু অধিকাংশ প্রসবজনিত মৃত্যুই প্রসব পরবর্তী সময়কালে ঘটতে দেখা যায়, ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রসব সংক্রান্ত অসুস্থতাগুলোও এ সময়ই বেশি হয়। বাচ্চা হওয়ার পরেও যে একজন প্রসূতি মায়ের জীবন নাশের আশঙ্কা থেকে যায়, সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানিনা। এদেশে মেয়েরা গর্ভধারণকালে এবং প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এ সংক্রান্ত স্থানীয় বিশ্বাস বা কী কী প্রচলিত চিকিৎসা রয়েছে সে সম্পর্কেও আমাদের খুব বেশি জানা নেই।

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুই জন্মগ্রহণ করে গৃহে ধাত্রীদের হাতে। সেজন্য প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশির ভাগ কর্মসূচির ধাত্রীদের কেন্দ্র করে গৃহীত হয়ে থাকে। ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্যগুলির একটি হচ্ছে প্রসূতির মৃত্যুহার হ্রাস করা। তবে প্রসবকালীন আচরণ (delivery practices) এবং ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ, প্রসূতির অসুস্থতার ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব রাখতে পারে এটা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যান্য কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস ও রোগ প্রতিরোধে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের প্রভাব খুব সামান্য। অপরদিকে, আমাদে গ্রামাঞ্চলে ধাত্রী ছাড়াও প্রসূতির আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা প্রসব করানো হয়। তাই যথাযথ ধাত্রী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় এ ব্যাপারে আরো গবেষণার দরকার।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং লণ্ডনের স্কুল অব হাইজিন এণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা এবং প্রসবকালীন চর্চার সাথে এর সম্পর্কের উপর একটি গবেষণা করেছে। এর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রসব-পরবর্তী সময়ের রোগগুলো চিহ্নিত করা সেগুলোর ধরণ নির্ধারণ করা এবং এ সমস্ত অসুস্থতার জন্য দায়ী কারণগুলো সনাক্ত করা। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে প্রসবের সময় কি ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে ধারণা নেওয়াও গবেষণার অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল।

[14] Summary of the RED research report entitled “”Maternal morbidity relating to delivey and the puerperium: belies and practices in rural Bangladesh”: by EA Goodburn et al. 1993, 30p. Also published in Stud Fam Plann 1995 January-February, 26(1):22-32. (Summarized in Bangla by Shahan Huda).

গবেষণার সময় ও পদ্ধতি

১৯৯১ সালে মানিকগঞ্জের তিনটি ইউনিয়নে মূল গবেষণার কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৯৩ সালে। মূল গবেষণার প্রস্তুতি হিসাবে শুরুতে দলগত আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে প্রসবকালীন আচার-আচরণ, প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা এবং বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধাত্রী ও মায়েদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা লাভ করা। এ আলোচনায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি দলে ১০ জন করে অংশ নেয়। দলগুলি হচ্ছে: (১) স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মা, যাদের বয়স ২৫ বছরের কম এবং বাচ্চার সংখ্যা সর্বোচ্চ তিন; (২) অভিজ্ঞ মা যাদের বয়স ২৫ এর উর্ধ্বে এবং সন্তান সংখ্যা তিনের অধিক; এবং (৩) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণ পায়নি এমন ধাত্রীরা।

এদের সাথে প্রধানত: তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (১) প্রসবকালীন অসুস্থতা এবং এ অসুস্থতা প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রচলিত বিশ্বাস, (২) সন্তান প্রসবের নিয়ম ও অভিজ্ঞতা, এবং (৩) প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্য সমস্যা।

ফলাফল

গর্ভকালীন এবং প্রসব-পরবর্তী বিধি নিষেধঃ গর্ভকালীন অসুস্থতার জন্য ফোকাস গ্রুপের সদস্যারা অশুভ শক্তির দৃষ্টি, বিভিন্ন খাবারের দোষ এবং শারীরিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছে।

অশুভ শক্তির বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে প্রসূতিদের বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মেনে চলতে হয়। ধাত্রী ও মায়েরা এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। বয়স্ক মায়েরা এসব স্থানীয় নিষেধাজ্ঞাকে যতোটা গুরুত্ব দেন, নতুন মায়েরা ততোটা দেন না। সতর্কতামলূক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে – দুপুরে, রাতে বা ঝড়ের মধ্যে বাইরে বের না হওয়া, খোলা চুলে বাইরে বের না হওয়া, ইত্যাদি। তাদের বিশ্বাস জ্বীন-ভূতের 'আছর' হলে সন্তানের অঙ্গহানি ঘটতে পারে বা গর্ভস্থ সন্তান মারা যেতে পারে। তারা বলেছেন, একজন মা সন্ধ্যায় বাঁশঝাড় দিয়ে হেঁটে যওয়ায় তার বাচ্চা গর্ভেই মারা গিয়েছিল, কারণ তাকে ভূতে 'আছর' করেছিল। বাচ্চা হওয়ার পর প্রসূতিকে আলাদা একটি ঘরে রাখা হয় এবং শয়তানের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ঘরের চারদিকে লোহা গঁথে দেয়া হয়।

গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিছু কিছু খাবার সম্পর্কে কিছু প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে, যেমন আনারস খেলে গর্ভপাত হয়, ডাব খেলে শিশু অন্ধ হয় বা চোখের মণি সাদা হয়, হাঁসের ডিমে হাঁপানি হয়, ইত্যাদি। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী মহিলারা জানান, বাচ্চা হওয়ার পর মুসলমান মহিলাদের ৭দিন এবং হিন্দু মহিলাদের এক মাস মাছ মাংস খেতে দেয়া হয়না। গরুর মাস ও ইলিশ মাছ খেলে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যেতে পারে এবং সূতিকা রোগ হতে পারে বলে এসবও খেতে দেয়া হয়না। কেউ কেউ প্রসব-পরবর্তী কয়েকদিন সারাদিনে মাত্র একবার খাবার গ্রহণ করে। এ সময়ে বেশি পানি পান করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় সর্বত্র প্রসূতিকে জিরা, মরিচ ও রসুনের গুড়ার একটি মিশ্রণ খেতে দেয়া হয়, কারণ তাদের ধারণা এটা জরায়ুর ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকাতে সাহায্য করে।

এছাড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বিভিন্ন কাজকর্মের উপর। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে বা ভারী কিছু তুললে গর্ভপাত বা অপূর্ণাঙ্গ সন্তান হতে পারে। গর্ভধারণের প্রথম ও শেষ তিনমাস সহবাস নিষেধ করা হয়। কারণ এতে গর্ভপাত হতে পারে বা ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম নিতে পারে।

প্রসবকালীন যত্নঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধত্রীরা গর্ভবতী মাসে পুষ্টি, কাজকর্ম, ধনুষ্টংকারের টিকা ইত্যাদি বিষযে পরামর্শ দেয় এবং রক্তশূন্যতা, হাতে পায়ে পানি আসা ইত্যাদি পরীক্ষা করে। তাদের কেউ কেউ বাচ্চার অবস্থান, যমজ কিনা, বাচ্চা উল্টো আছে কিনা অথবা আড়াআড়ি হয়ে আছে কিনা এসব বলতে পারে। তবে অধিকাংশ ধাত্রী মনে করে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকলে ৫ মাস থেকে চেক আপ করালেই চলে।

গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ গর্ভবতী মহিলা শুধুমাত্র প্রসবকালীন সময়েই ধাত্রীর শরণাপন্ন হন। সাধারণতঃ কোন রকম অসুস্থতা দেখা দিলে ধাত্রীর কাছে বা ফকির, কবিরাজের কাছে যান। অনেক ক্ষেত্রে প্রসূতির অত্মীয়রাই প্রসবে সহায়তা করে। খুব গুরুতর অসুস্থ না হলে কোন মহিলাই হাসপাতালে যেতে চায়না। প্রসূতি খুব অসুস্থ হলে ধাত্রীরাই প্রথমে আরোগ্যের চেষ্টা করে এবং শেষ মুহূর্তে ডাক্তারে কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

বাচ্চা হতে দেরী হলে মাকে হাঁটানো হয় ও তলপেটে তেল মালিশ করা হয়। মাঝে মাঝে ধাত্রীরা যোনীপথে তেল দিয়ে তা প্রসারিত করার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তারা জরায়ু পথে হাত ঢুকিয়ে দিযে বাচ্চার অবস্থান জানার চেষ্টা করে। প্রসবের দ্বিতীয় ধাপে সাধারণতঃ প্রসূতিকে দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঁচু করে বসানো হয়।

গর্ভফুল পড়াঃ অধিকাংশ মহিলার ধারণা যে, পসবের পর পরই যদি গর্ভফুল না পড়ে, তাহলে প্রসূতির মৃত্যুর আশংকা থাকে। ধাত্রীরা গর্ভফুল বের করার জন্য প্রসূতির গলায় আঙুল বা চুল ঢুকিয়ে বমি করায়, যাতে চাপে তা বেরিয়ে আসে। কেউ কেউ তলপেটে চাপও দেয়। কোন কোন ধাত্রী জরায়ুর ভিতর হাত দিয়ে গর্ভফুল টেনে বের করে আনে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের শেখানো হয় গর্ভফুল বের হওয়ার আগেই যেমন নাড়ি কেটে নবজাতককে আলাদা করে ফেলা যায়, যাতে সে মায়ের দুধ খেতে পারে। কিন্তু তারা সেটা করতে ভয় পায়। তাই গর্ভফুল বের না হওয়া পর্যন্ত ধাত্রীরা সাধারণতঃ নাড়ী কাটেনা।

প্রসব-পরবর্তী রক্তপাতঃ প্রসবের পর কতটা রক্তপাত হলে সেটাকে অতিরিক্ত বলে মনে করতে হবে এবং এ রক্তপাত যে প্রসূতির জন্য কতটা ক্ষতির এ ব্যপারে ধাত্রী বা প্রসূতির কোন সঠিক ধারণা নেই। কোন কোন ধাত্রী জানে যে, গর্ভফুলের অংশ বিশেষ ভেতরে থেকে গেলে রক্তপাত হয়। স্থানীয়ভাবে এ অতিরিক্ত রক্তপাতকে ‘রুহিনি’ বলে। এটা বন্ধের বন্য গরম পানি খেতে দেয়া হয় বা তলপেটে গরম সেক দেয়া হয়।

বাচ্চা হওয়ার পর যে স্রাব হয় এটা ৭দিন থেকে দু’মাস পর্যন্ত চলতে পারে বলে তাদের ধারণা। অনেকে একে শরীরের জন্য ভাল বলে মনেকরে কারণ এতে জমাটবাধা রক্ত বের হয়ে এসে জরায়ুও যোনীপথকে পরিস্কার করে দেয়।

অন্যান্য অসুস্থাতাঃ ইনফেকশন বা ক্ষত সম্পর্কেও কারো কোন সঠিক ধারণা নেই। প্রসূতির গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব অতিরিক্ত পরিমাণে বের হওয়াকে স্থানীয় ভাষায়, 'কষার দোস' বলে এবং এটি অতি পরিচিত সমস্যা, যা মাছ খাওয়ার ফলে হয় বলে মনে করা হয়। এই রোগে মরিচ, জিরা ও রসুনের গুঁড়োর সেই মিশ্রণটি খেতে দেয়া হয়।

প্রায় সব মা এবং ধাত্রীই বলেছে যে, অনেক মহিলারই প্রথমবার বাচ্চা হওয়ার সময় যোনীপথ ছিঁড়ে (Perineal tear) যেতে পারে। সামান্য ছিঁড়ে গেলে সেটা কোন সমস্যা নয় তবে বেশি হলে সেটা সমস্যা। পেরিনিয়াল টিয়ার হলে গ্রামে ঘরে তৈরি ঔষধ ব্যবহার করে, তবে খুব বড় হলে অর্থাৎ যোনীপথ ও মলদ্বারের পথ এক হয়ে গেলে সেলাইয়ের দরকার হয়, সেটা হাসপাতালে গিয়ে করা সম্ভব বলে তারা জানে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী মহিলারা বলেছে যে, পেরিনিয়াল টিয়ারের ফলে দু'জন মারা গেছে। একজন মহিলা হাসপাতাল গিয়ে সেলাই করার পর তার আর বাচ্চা হয়নি বলে ধারণা করা হয়েছে। আরেকজন মহিলার পেরিনিয়াল টিয়ার হওয়ার পর সে রক্তশূন্যতা ও ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ফিসটুলার (যোনীপথে ক্ষতের মাধ্যমে পেসাব, পায়খানা বের হয়ে আসা) কথাও সবাই জানে এবং এটাকে বেশ জটিল রোগ বলেই মনে করে।

কিছু কিছু অংশগ্রহণকারী জানিয়েছে যে, তারা দেখেছে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জরায়ু বা জরায়ুর অংশ বের হয়ে আসে (Prolapse)। এ অবস্থার সাথে মাঝে মাঝে রক্ত ও পূঁজ মেশানো থাকে এবং স্রাব হতে থাকে বলে তারা জানায়।

বাচ্চার অবস্থান ঠিকমতো না থাকলে ধাত্রীরা অনেক সময় তলপেটে অস্বাভাবিক চাপ দেয় এত জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে বলে তাদের ধারণা আছে। এছাড়া বাচ্চা হওয়ার পর ভারী কাজ করলেও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে তারা মনে করে। এ রোগে সাধারণত: স্থানীয় বা কবিরাজি চিকিৎসা করানো হয়।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী মা ও ধাত্রীরা একল্যাম্পশিয়া রোগের খিঁচুনি ও ধনুষ্টংকারের খিঁচুনির (Tetanus) মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা, কিন্তু এটা যে একট জটিল সমস্যা তা জানে। ধনুষ্টংকার যে টিকা দিয়ে রোধ করা যায়, খুব কম অংশগ্রহণকারী সেটা জানে। হাত-পায়ে পানি আসা ও খিঁচুনী হলে তারা একে ভূতের আছর বলে মনে করে।

বাচ্চা হওয়ার পর স্তনে ব্যথা, স্তন ভারী হয়ে যাওয়া ও অতিরিক্ত দুধ নিঃসরণকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'সাজোর আসা' বা 'দুধ বাড়া'। এর চিকিৎসা হিসাবে কেউ কেউ বাচ্চাকে দুধ দেয়ার আগে চাপ দিয়ে অতিরিক্ত দুধ বের করে দেয়, কবিরাজের কাছ থেকে ভেষজ ব্যাণ্ডেজ এনে স্তন বেঁধে দেয়, রসুন, জিরা ও মরিচের গুঁড়োর মিশ্রণ খাওয়ায়। যদি স্তনে কোন গোটা বা ফোঁড়া হয় এবং ব্যথা ও পুঁজ হয় তখনও ভেষজ চিকিৎসা করা হয় বা ফকির, কবিরাজের সাহায্য নেয়া হয়। একটি স্তনে এমন হলে মায়েরা সাধারণতঃ সন্তানকে ভাল স্তনটি হতে দুধ দেয়।

প্রসবের পর অনেক মায়ের ডায়রিয়া হয় এবং একে সূতিকা বলে। গ্রামাঞ্চলে একে খুব জটিল রোগ বলে মনে করা হয় এবং অশুভ শক্তির প্রভাবে এ অসুখ হয়েছে বলে ধারণা করে। সূতিকা দু'ধরণের –

বদহজমসহ তলপেটে ব্যথা, গুড়গুড় শব্দ, দুর্বলতা ও প্রসূতির ওজন হ্রাস পেলে তাকে শুকনো সূতিকা বলে, আর যখন এসব প্রসঙ্গে সাথ ডায়রিয়া যোগ হয়, তখন তাকে ভেজা সূতিকা বলে। ভারী কিছু বহন করলে, পাতাওয়ালা শাক-সবজি বেশি খেলে, প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে সহবাস করলে সূতিকা হতে পারে বলে গ্রামবাসীরা মনে করে। এর চিকিৎসা করানো হয় কবিরাজের দ্বারা।

কেন গর্ভবতী মহিলাদের পৃথক ঘরে রাখা হয়

প্রসবের পর থেকে প্রসূতিকে আলাদাভাবে রাখা হয়, স্থানীয় ভাষায় একে 'ছটি' বলে। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে জানা গেছে যে, গর্ভবতী মায়েদের গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় গর্ভকালীন সময় থেকেই। সাধারণতঃ ভূত -জ্বীনের আছর এবং পুরুষদের চোখের আড়ালে রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাচ্চা হওয়ার ঠিক পরের সময়টাকে মহিলাদেরকে 'অপবিত্র' মনে করা হয় এবং এসময় যেনো বাড়ির পুরুষদের শরীর অসুচি বা নাপাক হয়ে না যায় সেজন্য প্রসূতিকে আলাদা করে রাখা হয়। হিন্দুদের ক্ষেত্রে ছটি বা আঁতুড় ঘরে থাকার সময়কার ৩০ থেকে ৪০ দিন এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৭ দিন। তবে এসব নিয়মকানুন অবস্থাপন্ন পরিবারেই বেশি মেনে চলা হয়, দরিদ্র ও জর্মজীবী মহিলারা সেভাবে মানতে পারেনা।

আলোচনা

গ্রামীণ মায়েরা এবং ধাত্রীরা কতগুলো বিশেষ ও স্থানীয় পদ্ধতিতে গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নেয়, চিকিৎসা করে, সন্তান প্রসব করায় এবং প্রসব-পরবর্তী যত্ন নেয়। তাদের এ নিজস্ব নিয়মের মধ্যে কতগুলো খারাপ দিক রয়েছ। যেমনঃ

১) জরায়ুর ভেতরে হাত দেয়া এবং মালিশ করা;
২) যোনীপথকে প্রশস্ত করার জন্য তেল দেয়া;
৩) প্রসবের সময় তলপেট শক্ত করে বাঁধা অথবা চাপ দেয়া;
৪) নাড়ি ধরে টানা; এবং
৫) গর্ভফুল পড়ার জন্য জোর করে প্রসূতিকে বমি করানো।

আর ভাল দিকগুলো হচ্ছেঃ

১) প্রসূতিকে প্রসবের প্রথম পর্যায়ে খাড়া করে রাখা ও হাঁটানো;
২) দ্বিতীয় পর্যায়ে হাঁটুর উপর উঁচু করে বসানো (শোয়া অবস্থায় প্রসব মা ও শিশু উভয়ে জন্যই খারাপ;
৩) প্রসবের সময় বাচ্চা থলি জোর করে ছিদ্র না করা; এবং
৪) প্রসূতিকে মানসিক শক্তি দেয় ও সান্ত্বনা দেয়া।

আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গর্ভবতী মায়েরা বা প্রসূতিরা যতোক্ষণ ভাল থাকে, ততক্ষণ স্বাস্থ্য কর্মী, চিকিৎসক এমনকি ধাত্রীর কাছ থেকেও পরামর্শ নেয়না। আধুনিক প্রসব-পূর্ব যত্ন গ্রামীণ সমাজের পুরানো বিশ্বাসের সাথে খাপ খায়না এবং সর্বোপরি গ্রামের মায়েদের কাছে এর সেবা ঠিকমতো পৌঁছে না। এর একটা কারণ হলো হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর অবস্থান বাড়ি থেকে অনেক দূরে। অনেক মা প্রসব-পূর্ব যত্নের কথা জানেইনা।

প্রসব পরবর্তী সময়ে প্রসূতিকে আলাদাভাবে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত রীতি এবং এটা মায়ের প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরিচর্যার পথে একটি বড় বাধা। কোনো পুরুষ চিকিৎসককে দেখাতে হবে এবং বাড়ির বাইরে যেতে হবে, সম্ভবতঃ এই ভয়েই গ্রামীণ মহিলারা স্থানীয় প্রচলিত চিকিৎসার বেশি মূল্য দেয়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যে বিধিনিষেধ আছে সেগুলো হয়ত প্রসূতির পুষ্টি ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব বহন করে না, কারণ এ সমস্ত দামী খাবার একজন গ্রামীণ মা স্বাভাবিক অবস্থাতেও কমই খেতে পায়। দাত্রীদের দ্বারা মায়েদের জন্য গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন সঠিক পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে হলে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্বন্ধে প্রশক্ষণলব্ধ জ্ঞান কার্যকেত্রে প্রয়োগ করতে ধাত্রীরা দ্বিধাবোধ করে, তাই ধাত্রী প্রশিক্ষণকে হয়ত নতুন রূপ দিতে হবে।

এ গবষেণা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রসূতির স্বাস্থ্য পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রচলিত বিশ্বাস ও রীতিনীতি এবং সামাজিক প্রতিকূলতাক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং মায়েদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা[১৫]

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

বিশ্বজুড়ে মেয়েদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি এখন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ তাদের একান্ত শারীরিক সমস্যা ও মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টিকে অবহেলা করে অজ্ঞতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে।

গ্রামের মহিলাদের স্বাস্থ্য, অসুস্থতা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে গ্রামের পুরুষ এবং মহিলারা কী মনে করে, এর উপর ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৯৩ সালে একটি গবেষণা করেছে। জামালপুর জেলার নারায়নপাড়া, রূপসী এবং দোহারপার এই গবেষণার আওতাভুক্ত ছিল। নীতিনির্ধারকরা যাতে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে, এজন্য মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত চিহ্নিত করা ছিল এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামের অধিকাংশ পুরুষের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই বরং রয়েছে অবহেলা। দৈনন্দিন কাজ করতে পারলেই একজন মহিলার স্বাস্থ্য ভাল বলে ধরে নেয়া হয়। খুব ব্যথা বা জ্বরের কারণে যখন তাদের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় এবং তারা যখন একদম কাজ করতে পারে না, কেবল তখনই তারা অসুস্থ বলে বিবেচিত হয়। তদুপরি অধিকাংশ অসুস্থ মহিলাই স্বামীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা বা যত্ন পায়না।

বাংলাদেশের প্রসূতি মৃত্যুর হার অনেক বেশি এবং গর্ভধারণের সময় থেকে বাচ্চা হওয়ার পর পর্যন্ত একজন মা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অথচ মেয়েদের গর্ভধারণ, প্রসব ও যৌনরোগকে কোন অসুখ বলে মনেই করা হয় না। সামাজিক অবস্থার কারণে মেয়েরাও নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নবান হয় না। একটি সক্ষম দম্পতি কখন এবং কয়টি বাচ্চা নেবে, এটাও নির্ধারণ করে স্বামী বা শ্বশুপ বাড়ির লোকজন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামতের মূল্য নেই বললেই চলে, যা স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফলতার পথে বাধাস্বরূপ। কারণ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচিগুলো অধিকাংশই নারীকেন্দ্রিক। কিন্তু মেয়েদের স্বাস্থ্যের উপর যে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক, এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছে কর্মসূচি প্রণেতারা।

ভালো স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণাঃ গ্রামের পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সুস্থতা বলতে বোঝে কাজ করার প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্ষমতা থাকা, হজম শক্তি ভাল থাকা, কোন রকম ব্যথা না থাকা, চলাচল করতে পারা, নিরুপদ্রব ঘুম হওয়া ও মানসিক শান্তি পাওয়া। সুস্থতা বোঝাতে গিয়ে অনেক মেয়েই মানসিক শান্তির উপর জোর দিয়েছে। তাদের মতে মন খারাপ থাকলে শরীর খারাপ মনে হয়।

---

[15] Summary of the RED research report entitled “Women’s health and illness: perception of men and women in the rural areas of Bangladesh” by SM Ziauddin Hyder, 1993 September, 15p (Summarized in Bangla by Shahana Huda.

পুরুষরা মনে করে মেয়েরা প্রায়ই বাবার বাড়ির কথা ভাবে বলে মানসিকভাবে অসুস্থবোধ করে। তারা আরো মনে করে যে, মেয়েরা ঘরের কাজ না করার জন্য জ্বর, বমি, হাত-পা জ্বলে ও অরুচি হয় বলে অসুস্থতার ভান করে। স্ত্রীরা অসুস্থ হলে স্বামীরা একে ঝামেলা বলে মনে করে, বিরক্ত হয় এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার হুমকি দেয়। তাই স্ত্রীরা নিজেদের অসুস্থতা যতোদূর সম্ভব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং যখন অবস্থা খুবই গুরুতর হয তখন বাধ্য হয়ে স্বামীকে জানায়। স্ত্রী অসুস্থ হলে অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্রের কারণে স্বামীরা কিছু করতে পারে না। কোন স্বামী কিছুটা চিকিৎসা করায়, আবার কেউ কেউ বাবার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আসতে বলে।

মেয়েদের অসুখঃ শ্বেতস্রাব বা শ্বেতী মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ভোগায়। এ রোগের ফলে দুর্বলতা ও মাথা ব্যথা হয় এবং হাত-পা জ্বলে। অনেক মহিলা মনে করে, 'মায়াবড়ি' খাওয়ার ফলে এমন হয়। এ ক্ষেত্রে কবিরাজি চিকিৎসা করায় সবাই। কারণ তাদের মতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এর কোন চিকিৎসা নেই।

অনিয়মিত রজঃস্রাব মহিলাদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় সমস্যা হলেও পুরুষদের কাছে এটাই প্রথম সমস্যা। মায়াবড়ি খেয়ে বা জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন নেয়ার এই সমস্যা হচ্ছে মনে করা হয় এবং ভেষজ চিকিৎসা করানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভেষজ চিকিৎসা করার পর তলপেটে তীব্র ব্যথা হয় এবং প্রচণ্ড রক্তপাত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী মারাও যায়। গ্রামের মহিলারা এই রোগের সাথে ঋতুবন্ধ রোগের প্রভেদ করতে পারে না বলে প্রায়শই অনাকাংখিতভাবে সন্তান সম্ভবা হয়ে যায়।

জরায়ু নিচে নেমে আসা বা জরায়ুর দোষ মেয়েদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকর সমস্যা। এই রোগ হলে হাঁটা যায় না, কাজ করা যায়না, সহাবস কষ্টকর হয় এবং তলপেটে তীব্র ব্যথা হয় ও শ্বেতস্রাব হয়। স্বামীকে এসব অসুবিধার কথা জানানো যায় না্ কারণ তারা এ রোগকে ঘৃণা করে। এ ক্ষেত্রেও কবিরাজি চিকিৎসা করায় সবাই।

মেয়েদের মতে তাদের প্রায়ই সাপের নিঃশ্বাস ও পোকার বাতাস লাগে। এই রোগের লক্ষণ মাথাব্যথা, বমিভার, জ্বর ও দুর্বলতা। এই রোগের ঔষধ দিতে পারে একমাত্র ওঝা, এটাই বিশ্বাস করে সবাই। এসব ছাড়াও স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের আমাশয় একটি বড় সমস্যা। অধিকাংশই ভেষজ চিকিৎসা করায়, মাঝে মাঝে এলোপ্যাথিক ঔষধ খায়।

গর্ভকালীন পরিচর্যাঃ গর্ভধারণ ও মাসিক স্রাবকে অধিকাংশ মহিলাই কোন রকম অসুস্থতা বলে মনে করেনা। পুরুষ ও মহিলা উভয়ই গর্ভধারণকে আলাহ্‌র দান বলে মনে করে। কাজেই প্রসূতির দেখাশোনার ভারও আলাহ্‌র। ধাত্রীরা বরাবর গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতির দেখাশোনা করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা গর্ভবতী মহিলাদের দেখে না এবং প্রসব সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়না। প্রসব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা গ্রামীণ মহিলারা পায় না। স্বামীরাও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না। এসময় মেয়েরা বাইরে গেলে শয়তান বা ভূতের আছড় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হয়। তবে কারো মরণাপণ্ন অবস্থা হলে তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নেয়া হয়।

অল্প কয়েকজন ছাড়া মহিলারা গর্ভকালীন সময়ে খাবারের উপর কোন বিষেধাজ্ঞা মানতে আগ্রহী নয়। অনেকেই গর্ভবতী মাকে সুষম খাদ্য দেয়ার পক্ষে, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সেটা সম্ভব হয় না। কেউ কেউ মনে করে গর্ভবতী মাকে বাড়তি খাবার দেয়া উচিৎ নয়, বরং কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু সব মায়েরাই প্রসবের পরের ৭ দিন খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে, এবং বাচ্চার জন্মের ২/৩ দিন তাকে মায়ের দুধ না দিয়ে চিনি বা মধু পানি দেয়া হয়।

পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত ঃ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই ছেলে সন্তান কামনা করে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাদের ধারণা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী মহিলারাই ব্যবহার করবে, ভ্যাসেকটমি করালে ছেলেরা দুর্বল হতে পারে ও মরেও যেতে পারে। প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসাবে পুরুষ সদস্যটির সুস্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। মেয়েরা অসুস্থ হলে ক্ষতি নেই। কারণ, তাদের উপর পরিবারের আয়-রোজগার নির্ভর করে না।

সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা ঃ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা কোন রকম স্বাস্থ্য পায়না বললেই চলে। উপরন্তু তাদের ভাগ্যে জোটে দুর্ব্যবহার। মহিলারা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার ও গর্ভবতী মায়ের যত্ন সম্পর্কে খুব কমই পরামর্শ পায়। অথচ প্রতিটি ইউনিয়নেই রয়েচে সরকারি মাতৃসদন ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র।

সরকারি স্বাস্থ্য কর্মীরা এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মহিলারা যখন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'এম আর' করতে যায় তখন স্বাস্থ্য কর্মীরা খুব খুশি হয়। কারণ এম আর এর জন্য তারা অনেক টাকা পায়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মহিলারা আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত আছে। কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসকদের কাছে যেতে পারেনা।

গ্রামের লোকদের যথাযথ স্বাস্থ্য-শিক্ষা দিতে পারলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

স্বাস্থ্য ও মহিলাদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন নির্ণয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ঃ একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা[16]

এ্যালেন এডাম্‌স, রীতা দাশ রায় ও আমিনা মাহবুব

চাঁদপুর জেলার মতলবে ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ এলাকার দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠান দু'টির বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি কী প্রভাব রাখছে তা দেখা। সে সাথে ঐসব কর্মসূচি বাস্তবে কিভাবে প্রভাব ঘটায় তার কার্যকারণ এবং গতিপথ (Pathway) সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং প্রভাবের গতিপথসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। যদিও প্রভাব বা ফলাফল পরিমাপের জন্য বিভিন্ন রকম পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণা পদ্ধতিই যথেষ্ট, কিন্তু প্রভাবের গতিপথ বোঝার জন্য কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। কর্মসূচির সাথে ফলাফলের জটিল কিন্তু গতিশীল বিভিন্ন কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি দরকার। বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাবের গতিপথ নির্ণয়েল পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

মহিলাদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন অনুধাবনে এ ধরনের গুণগত কী কী গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এটা জামালপুরের তিতপল্লা এলাকার পাবই এবং মোহনপুর নামক দু'টি গ্রামে করা হয়। প্রথমটিকে পাঁচ বছর এবং দ্বিতীয়টিতে এ গবেষণা শুরু হওয়ার ছয় মাস আগে থেকে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ চলছিল। যে দু'টি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ (১) তথ্য প্রদানকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন গুণগত গবেষণা পদ্ধতি যথার্থতা নির্ণয় করা; (২) স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ এবং সমাজে মহিলাদের স্থান সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রামবাসীদের নিজস্ব সূচকগুলিকে চিহ্নিত করা, এবং সময়ের সাথে সাথে ঐসব সূচকগুলিতে যে পরিবর্তন হয়েছে সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা অনুসন্ধান করা।

গবেষকগণ বিম্নোক্ত অংশগ্রহণমূলক গুণগত পদ্ধতিগুলি পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক দলের সাথে ব্যবহার করেছেনঃ

১) সামাজিক ও জনমিতিক মানচিত্র (Social and demographic mapping);

[16] Summary of the RED research report entitled "Participatory methods to assess changes in health and women's lives: an exploratory study for the BRAC-ICDDR,B joint project in Matlab" by Alayne Adams, Rita Das Roy and Amina Mahbub, 1993 September, 25p (Summarized in Bangla by Ashrafun Nessa).

২) স্বাস্থ্য ও ঘনসম্পদের স্তূপীকৃত সারি বিন্যাস (Health and wealth pile-sort ranking);

৩) স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের শ্রেণী বিন্যাস (Health service utilization matrix ranking);

৪) কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি বিশ্লেষণ এবং যৌথ আলোচনা ঃ ব্র্যাকভুক্ত এবং ব্র্যাকভুক্ত নয় এমন দলের সঙ্গে বিয়ে এবং পরিবারের গঠন, সামজে মেয়েদের স্থান, খানার সদস্যদের স্বাস্থ্য এবং জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের ধারণা বিষয়ে আলোচনা;

৫) গ্রাম দু'টির কয়েকজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির কয়েকজন নির্বাচিত কর্মীর সাথে সাক্ষাৎকার; এবং

৬) নির্বাচিত মহিলাদের জীবন চক্রের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে নিবিড় সাক্ষাৎকার-এর ভিত্তিতে জীবনেতিহাস (life history) রচনা।

সমস্ত পদ্ধতিটাই ছিল তথ্য প্রদানকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। তথ্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করার ব্যবস্থা ছিল। গবেষণার ফলাফলকে দু'ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক (নধংবষরহব) তথ্য সংগ্রহের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক গুণগত গবেষণা পদ্ধতি উপযোগিতাঃ

প্রচলিত জরিপ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে বিভিন্ন চজঅ (চধৎঃরপরঢ়ধঃড়ৎু জঁৎধষ অঢ়ঢ়ৎধরংধষ) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, গ্রাম্য অবকাঠামো, খানার জনমিতি, আত্মীয়তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধনসম্পদ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত এবং তুলনামূলক নির্ভুলভাবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক ও অন্যান্য মানচিত্রায়ন (সধঢ়ঢ়রহম) এবং শ্রেণী বিন্যাসকরন পদ্ধতি খুবই কার্যকর। তবে এর জন্য দলগত কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এটা একটা প্রশস্ত, নিরিবিলি জায়গায় করতে হবে যাতে পথচারী বা শিশুদের অযাচিত ঔৎসুক্যকে আড়াল করা যায়। আবার এমন জায়গা হতে হবে যাতে যারা চায় সবাই যেন কোন সামাজিক বা অন্যকোন প্রতিবন্ধতা ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে পারে। মোট কথা, অংশগ্রহণকারীরা যেন খোলাখুলি প্রাণবন্তভাবে সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে এবং কেউ যেন এককভাবে আলোচনায় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। সব ক্ষেত্রেই যৌথ আলোচনার ফলাফলকে সর্বসম্মতিক্রম কার্ড এ লিপিবদ্ধ করা হয়।

গবেষণার এই অংশের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে,

১) সামাজিক ও জনমিতি সংক্রান্ত মানচিত্রায়ন এ ধরনের গবেষণা কাজ শুরু করার জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে ঐ গ্রামের খানাগুলির অবস্থান নির্ণয় এবং নমুনা সংগ্রতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া গ্রামবাসীদের সাথে দ্রুত সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

২)	মানচিত্রায়নের সময়ে ভৌগলিক অবস্থান (রাস্তা, ধানক্ষেত বা খাল) দ্বারা আলাদা করা এলাকাগুলি এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে এক একটি এলাকায় ৩৫ থেকে ৪০ টির বেশি খানা না থাকে। প্রতিটি এলাকার জন্য আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যাতে পরে একসাথে করলে সমস্ত গ্রাম সম্পর্কে একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

৩)	পুরুষদের চেয়ে মহিলারা খানার জনমিতি সংক্রান্ত তথ্য বেশি নির্ভুলভাবে দিতে পারে। খানার তথ্য সংগ্রহের সময় বিভিন্ন বয়সের ভাগটা আগে থেকে ঠিক করে দিতে হবে। যেমন, শিশুদের বেলায় যারা এখনও স্কুলে যায়নি তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়।

৪)	তথ্য সংগ্রহের সময় একঘেঁয়েমি এড়াবার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মধ্যে আলাপ আলোচনায় উৎসাহ দিতে হবে।

৫)	শ্রেণী বিন্যাসকরণ একটা জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটা ধারণা পাওয়া যায়।

৬)	কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জির বিশ্লেষণ অতীতের কোন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা কিংবা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আরও নিবিড় তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসে।

৭)	ব্র্যাকের কর্মীদের সাথে কর্মসূচি সম্পর্কে সাক্ষাৎকার সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য খুবই দরকারী। এতে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচির প্রকৃত অবস্থা জানা যায় এবং সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে তারা কতটুকু নিবেদিত তাও বোঝা যায়।

৮)	জীবনেতিহাস (খরভব যরংঃড়ৎরবং) মহিলাদের জীবন সম্পর্কে নিবিড় তথ্য জানার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এটা ব্র্যাকের কর্মসূচি তাদের জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা অনুসরণ ও অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ এবং সমাজে মহিলাদের অবস্থা নির্ণয়ে ঐ অঞ্চলের লোকজ সূচকসমূহ এবং সময়ের সাথে সাথে তার পরিবর্তনঃ

এই গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাম দু'টির পুরুষ ও মহিলারা ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য ও মহিলাদের অবস্থান নির্ণয়ে কী মাপকাঠি বা সূচক ব্যবহার করে তা চিহ্নিত করা হয়। তারা ধনম্পদের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের খানাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে ঃ

ক)	সম্পদশালী (ধনী/বেশি ধনী/খুব বেশি ধনী)

- জমির পরিমাণ ১.৫ একর বা তার বেশি (কোন কোন জমি পতিত রেখে দেয়)
- নিয়মিত আয়ের একাধিক উৎস (চাকুরী এবং/বা ব্যবসায়)
- বড় খানাঘর (একাধিক কক্ষ/টিনের ছাদ/পাকা ঘর)

- শিক্ষিত
- কৃষি সরঞ্জাম আছে (ট্রাকটর, শ্যালেঅ টিউবওয়েল)
- পশু সম্পদ আছে
- সারা বছরের খাদ্য মজুত থাকে

খ) মধ্যম (মাঝারি/মধ্যম ধনী/কিছু কম ধনী/একটু গরীব/ মধ্যম শ্রেণী)

- জমির পরিামণ ০.৫-১.৫ একর (কোন জমি পতিত রাখে না, সব চাষাবাদ করে)
- আয়-উপার্জনের একাধিক উৎস আছে (চাকুরী, ব্যবসা)
- বছরের অধিকাংশ সময়ের জন্যই খাদ্য মজুত থাকে
- ঋণ করতে হয় না।

গ) গরীব (নিম্ন/গরীব/বেশি গরীব/দরিদ্র)

- জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম বা ভূমিহীন (ভিটেবাড়ি আছে
- দিনমজুর, মাছ বা শাক-সব্জি বিক্রেতা, রিক্সাচালক
- খাবার নিশ্চয়তা নাই ঃ দৈনিক উপার্জনের উপর খাবার প্রাপ্তি নির্ভর করে; দিনে একবেলা ভাত খায়।
- বাঁচার জন্য ধার-দেনা করতে হয়

একইভাবে স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে তারা গ্রামের খানাগুলিকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে ঃ

ক) সুস্থ (ভাল স্বাস্থ্য)

- শরীর ও মনের কোন অসুখ নাই
- কাজকর্মে কোন অসুবিধা নাই (পরিশ্রমী)
- যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খায়
- সম্পদশালী হওয়ার কারণে কোন চিন্তা/উদ্বেগ নাই

খ) কখনও কখনও অসুস্থ (অর্ধেক ভাল/মাঝারী স্বাস্থ্য)

- কখনও কখনও অসুখে পড়ে
- অসুস্থ হলে ঠিকমত কাজ করকে পারে না
- দ্রুত নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার ক্ষমতা আছে
- চিকিৎসার করানো সংগতি আছে

গ) অসুস্থ (সম্পূর্ণরূপে অসুস্থ, খারাপ)

- শরীর দুর্বল, শুকনা, মনে কোন জোর নাই

- পরিশ্রম/কাজ করতে পারে না
- প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের সংগতি নাই
- চিকিৎসা করানোর সংগতি নাই

এই শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ধনসম্পদের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সূচক নির্ণয়ে প্রায ৯০% সামঞ্জস্য থাকলেও স্বাস্থ্য সূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য মাত্র শতকরা ৪০ ভা। যাই হোক, উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি খানার সামগ্রিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এ সূচকগুলি সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

১) খাদ্যের নিশ্চয়তাঃ সারাদিনে যে কয়বেলা ভাত খেয়েছেঃ এক, দুই বা তিন,
২) জমির পরিমাণঃ ভূমিহীন বা ০.৫ একর থেকে ১.৫ একর জমি, ১.৫ একরের বেশি জমি,
৩) আয়-উপার্জনের উৎস ও ধরনঃ চাকরি, ব্যবসায় বাণিজ্য, দিনমজুরী ইত্যাদি,
৪) কৃষি যন্ত্রপাতি ও পশু মালিকানাঃ পাওয়ার টিলার, শ্যালো টিউবওয়েল, গরু, ষাঁড়, ছাগল ইত্যাদি,
৫) খানার মালিকানা ও উপকরণঃ কক্ষের সংখ্যা, ছাদ ও বেড়ার উপকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি,
৬) প্রাপ্তবয়স্ক খানা সদস্যের কতজন অসুস্থতার জন্য আয় উপার্জন করতে পারে নি, এবং
৭) শিক্ষাগতযোগ্যতা।

এইসব সূচককে সমন্বিত করে একটি আর্থ-সামাজিক সূচক তৈরি করা গেলে তা খানাগুলিকে শ্রেণী বিন্যাস করা এবং খানাগুলিতে উন্নয়ন কর্মসূচির ফলাফল নিরীক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

মহিলা ও পুরুষদলের সাথে সাথে যৌথ আলোচনা (ঋড়পঁং মৎড়ঁঢ় ফরংপঁংংরড়হ) এবং কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি (ঞরসবষরহব) বিশ্লেষণ করে গত এক দশকে গ্রাম দু'টিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দৃশ্যমান হয়ঃ

- আয়-উপার্জনের উৎসের বহুমুখিতা;
- ধানের দাম কমে যাওয়া এবং সারের দাম বাড়া;
- টিকা দেয়অর ফলে শিশুমৃত্যু কমে যাওয়া;
- অধিকহারে দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ;
- ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার হার বেড়ে যাওয়া;
- মেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধি বেড়ে যাওয়া;
- আয়-উপার্জনকারী কাজে মহিলাদের অধিক হারে অংশগ্রহণ;
- চলাফেরায় মেয়েদের স্বাধীনতা বেড়ে যাওয়া; এবং
- আশির দশকের শুরু থেকে যৌতুক আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়া।

এছাড়াও ব্র্যাকের গ্রামসংগঠনভুক্ত মহিলারা ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খানার আয়-উপার্জনে অবদান রাখা এবং তার ফলে পরিবারের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত আগের তুলনায় কিছুটা হলেও

দাম দেয়ার বিষয়টাকে তারা উলেøখযোগ্য পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করে। মহিলাদের জীবনের এসব বিষয়গুলিকে আরো ভালভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি যেমন, জীবনেতিহাস সংগ্রহ, কোন বিশেষ উলেøখযোগ্য ঘটনা যেমন তালাক, নারী নির্যাতন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ (ঈধংব ঝঃঁফু) ইত্যাদি অধিক উপযোগী বিবেচিত হয়। এছাড়াও গ্রামের কিছু নির্বাচিত ওয়াকিবহাল ব্যক্তি এবং আরডিপি'র গ্রাম সংগঠকদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার ও এ কাজে বিশেষ ফলপ্রসূ মনে হয়। মোটের উপর মহিলাদের জীবনে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচি কিভাবে তাদেরকে বদরে দিচ্ছে তা অনুধাবন এবং নিরীক্ষণ করতে চাইলে এ ধরনের গবেষণা পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই।

উপসংহারে বলা যায়, যে দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমীক্ষাটি করা হয়েছিল তা সার্থকভাবেই সম্পন্ন করা গেছে। এর মাধ্যমে এ কাজে উপযোগী কিছু গবেষণা পদ্ধতি আর কিছু লোজক উন্নয়ন সূচক পাওয়া গেছে যা মতলবে পরবর্তীতে উন্নয়ন কর্মসূচি ও তার প্রভাবের কার্যকারণ সম্পর্ক উদঘাটনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎস পদ্ধতি ঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না সহযোগিতা?[১৭]

সৈয়দ মাসুদ আহমদ

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অঞ্চল, দেশ বা এলাকাভেদে রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ক্রমশঃ পরিশীলিত ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হয়ে রূপ নিয়েছে প্রাচীন আয়ুর্বেদ বা কবিরাজি, ইউনানি বা হেকিমি এবং বিভিন্ন লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতিতে। প্রকৃতিজাত বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, উপাদান ও উপকরণ থেকে এসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে এসব চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে অন্যান্য উন্নয়শীল দেশের মত বাংলাদেশেও আধুনিক এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি-র পাশাপাশি একই সঙ্গে অবস্থান করতে দেখা যায়। এ অবস্থাকে বলা যায় বহুমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা বা Medical pluralism।

'২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিটি দেশের স্বাস্থ্য কার্যক্রমে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে দেশীয় চিকিৎসা সম্পর্কে জনমনে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এ আগ্রহের প্রধান কারণ এসব পদ্ধতির ঔষধগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন, সহজলভ্য এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা।

বাংলাদেশের অবস্থা

বহুমুখী চিকিৎসা পদ্ধতির উপস্থিতি বাংলাদেশের সমাজ জীবনে একটি বাস্তব ঘটনা। স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারীদের উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ধরনের দেশজ চিকিৎসক ও হাতুড়ে ডাক্তাররাই গ্রাম বাংলার অধিকাংশ অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করে থাকে। গ্রাম এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদেরকে তারা এভাবে ভাগ করেছেন ঃ

১. পাশ করা ডাক্তার – MBBS/LMF/National;

২. হাতুড়ে ডাক্তার – চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী নাই কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে এমন ব্যক্তি;

৩. হোমওপ্যাথ – ডিগ্রীধারী/সৌখিন বা স্বশিক্ষিত;

৪. বিভিন্ন ধরনের প্যারামেডিক্স – যেমন পল্লীচিকিৎসক, স্বাস্থ্য সহকারী ইত্যাদি;

---

[17] Summary of the RED review paper entitled "Traditional medicine and modern medicine: confrontation or cooperation?" by Syed Masud Ahmed, 1993 September, 17p. (Summarized in Bangla by Ashrafun Nessa).

৫. কবিরাজ – যার আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা করেন; এদের কারও কারও প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী আছে;

৬. হাকিম – যারা ইউনানী পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন। এদের মাঝেও প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীধারী আছেন।

৭. ঝাড়–ফুঁক, পানিপড়া, তেলপড়া, তাবিজ, বনরাজি, ইত্যাদি বিভিন্ন লোজক চিকিৎসা। এদের ইংরেজীতে Faith heale বলা হয়। মানুষের ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত সংস্কার বা বিশ্বাসই এদের চিকিৎসার মূলধন।

দেখা যাচ্ছে, দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি বলতে কোন একটা সুসংহত চিকিৎসা পদ্ধতিকে বোঝায় না। আধুনিক এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির বাইরে, দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক সামর্থের উপর নির্ভর করে, স্বনিয়োজিত পুঁজির ব্যবস্থাপনায় এই চিকিৎসা পদ্ধতি দাঁড়িয়ে আছে।

উপরে যে ভাগগুলো দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ৫ থেকে ৭ নভেম্বরের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে জনগণের ধারণা

কেউ কেউ মনে করেন, এ্যালোপ্যাথি ঔষধ রোগের কারণ নিরাময়ের চেয়ে রোগের রক্ষণগুলি দূরীকরণে বেশি ফলপ্রসূ। আশরাফ ও তার সহযোগীরা টাঙ্গাইলের দু'টি ইউনিয়নে কাজ করার সময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, মুসলমান বা হিন্দু, ধনী বা গরীব নির্বিশেষে যদিও গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ীই রোগ হয়, তবুও তারা বিভিন্ন রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ আছে বলে মনে করে। আর একজন গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রামবাসীরা মোহওপ্যাথি ও কবিরাজ চিকিৎসা পদ্ধতিতে স্থায়ী রোগ নিরাময় হয় বলে মনে করে, যদিও এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুব ধীরে ধীরে কাজ করে। অন্যদিকে তাদের মতে, এ্যালোপ্যাথি দ্রুত কাজ করে বটে কিন্তু এতে রোগের স্থায়ী নিরাময় হয় না। এজন্যই শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিক তারা মনে করে, পুরুষের রোগ ভোগের ক্ষমতা কম, তা ছাড়াও তাদের অসুখ হলে উপার্জন বন্ধ হয়ে যেতে পারে – সেজন্য পুরুষের দ্রুতি আরোগ্য লাভ প্রয়োজন এবং এজন্য তার এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়ে থাকে। পূর্বে উলেখ্লিত আশরাফ ও সহযোগীদের গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শিশুদের জন্য হোমওপ্যাথি, মহিলাদের অসুখ ও 'সাপ বাতাসের' জন্য লোকজ চিকিৎসা এবং নিউমোনিয়া ও রক্ত আমাশার জন্য এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা অধিকতর পছন্দ করা হয়। গ্রাম এলাকায় হাতুড়ে ডাক্তার, বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যকমী, ঔষধের দোকানদার রোগীদের ব্যাপক হারে এ্যালোপ্যাথি ঔষধ দেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলেতে সরকারে সুষ্ঠুনীতিমালা না থাকলে দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির অবস্থা ও অবস্থান খুই নাজুক। শতকরা ১০ ভাগেরও কম লোক এখন কবিরাজি, হাকিমি ইত্যাদি চিকিৎসা গ্রহণ করে।

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারি নীতি ও কার্যক্রম

বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের তৎকালীন চিকিৎসা ভূবনে স্বসম্মানে আসীন দেশী কবিরাজি, হাকিমি ও বনজী ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি সরকারি সমর্থনের অভাবে ধীরে ধীরে তার অবস্থান হারাতে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত তার ঠাঁই হল দরিদ্র জনযোগষ্ঠীর গৃহে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক (এ্যালোপ্যাথি) চিকিৎসার বিদ্রোহী সন্তান হোমিওপ্যাথি এদেশে আসে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে যারা প্রার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন, সুলভ ও সুবিধাজনক চিকিৎসা করাতে চায়। হোমিওপ্যাথিকে সঠিক অর্থে দেশীয় বলা যায় না। কেননা এটার উদ্ভব জার্মানীতে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক, প্রাচীন, বা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অযোগ্য বলে অবহেলা করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। স্বাধীনতার পরপরই দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ১৯৬৫ সালে প্রণীত 'ইউনানি, আয়ূর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আইন" বহাল রাখা হয়। গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মান উন্নয়ন করে এর কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। দেশের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তিকে ব্যবহার করে '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করার বিষয়টি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নয়নকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় দিক থেকেই উদ্যোগ নিতে বলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশ বলে হোমিওপ্যাথি এবং ইউনানি ও আয়ূর্বেদিক পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য দু'টি পৃথক বোর্ড গঠিত হয়।

বাংলদেশে প্রায় ছয় হাজারের মত নিবন্ধনকৃত (বা নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত) দেশীয় পদ্ধতির চিকিৎসক আছে। তাদের মধ্যে ৭৫০ জনের প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী আছে। এছাড়া হাজার হাজার অনিবন্ধনকৃত চিকিৎসক ছড়িয়ে আছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

বর্তমানে সরকার অনুমোদিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ১০টি ইউনানি এবং ৫টি আয়ূর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঢাকার মিরপুরে একটি ইউনানি ও আয়ূর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ এবং ১০০ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে বছরে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজে ৫ বৎসর ব্যাপী ডিগ্রী কোর্স (+৬ মাসের ইন্টার্নশীপ) খোলা হয়েছে। এছাড়াও এই পদ্ধতির মানোন্নয়নের জন্য একটি গবেষণাগার এবং ঔষধ উৎপাদনের জন্য একটি ইউনিট খোলার পরিকল্পনাও আছে ১৯৮২ সালে ঘোষিত ঔষধ নীতিতে ইউনানী এবং আয়ূর্বেদিক ঔষধের উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণেও আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম একটি পদ্ধতি হচ্ছ বিভিন্ন লোকজ পদ্ধতি যেমন ঝাঁড়-ফুক, তাবিজ, বনাজি, পানি পড়া, ইত্যাদি। এ পদ্ধতিটিও অতি প্রাচীনকা থেকে চলে আসছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ পদ্ধতিতে প্রধানত: তিন ধরনের অসুখের চিকিৎসা করা হয়, যেমন: (ক) ক্ষণস্থায়ী রোগ যা নির্দিষ্ট সময়ের পর এমনিতেই ভাল হয়ে যায় (যেমন ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত রোগ), (খ) জীবনের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে আশংকাজনক নয়

এমন ধরনর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ (যেমন হাঁপানী) এবং (গ) বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের শারীরিক প্রতিফলন বা নানা ধরনের ব্যক্তিত্বের সমস্যা (Personality disroder)। এর সবগুলো অবস্থাতেই ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার চাইতে উদ্ভূত মানিসক অবস্থার চিকিৎসা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতিটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও এটা কোনো কোনো অসুখের নিরাময়ের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকগত ও মানসিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সেজন্যই তা এত জনপ্রিয়।

রেগের শারীরিক দিকের পাশাপাশি মানসিক সংস্কৃতিগত দিকটির চিকিৎসার জন্য বনাজী/ঝাঁড়-ফুক ইত্যাদি লোকজ চিকিৎসা বর্তমান আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক হয়ে কাজ করতে পারে এবং এভাবে শুধু অসুখের চিকিৎসা নয়, বরং রোগীর পূর্ণাঙ্গ চিকিসা হতে পারে। বর্তমানে আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্তায় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির কোন উপস্থিতি নাই। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিপূরক বা সম্পূরক হিসাবে দিশীয় পদ্ধতিকেও এর আওতায় আনতে হবে। নতুন করে দেশীয় পদ্ধতির চিকিৎসক তৈরি না করে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে যারা ছড়িয়ে আছে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয় জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। এই পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে। লোকজ পদ্ধতির কোনো কোনো অংশকেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। তবে একটা জিনিষ অবশই খেয়াল রাখতে হবে যে, এসব পদ্ধতির মধ্যে প্রমাণিত কোন ক্ষতির পদ্ধতি বা ঔষধ অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে। দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেই একটা করতে হবে।

আশা করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে এভাবে আধুনিক ও দেশীয় পদ্ধতির পরস্পরে প্রতি শ্রদ্ধা ও সাহায্য সহযোগিতার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, যা আরো দক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেবে। আর ইটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসকদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা স্বীকৃতি ও সহযোগিতার সুপারিশের সাথেও হবে সংগতিপূর্ণ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি ও দারিদ্র[১৮]

করিমুল হক

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ সীমিত। এ দিয়ে তাদের খাদ্য, সন্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যাদের আয় কম, তাদের পক্ষে সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। কেননা উপার্জনের উপর নির্ভর করে ক্রয় ক্ষমতা। যাদের ন্যুনতম মৌলিক চাহিদা মেটানোর সামর্থ নেই, তারাই সাধারণতঃ অপুষ্টির শিকার হয়। তারা শুধু ধনেই দরিদ্র নয়, পুষ্টিতেও দরিদ্র। এ ধরনের দারিদ্রকেই বলা হয়েছে পুষ্টিগত দারিদ্র, অর্থাৎ এ দারিদ্রকে মাপা হচ্ছে পুষ্টি দিয়ে। সরকারি হিসাবে ১৯৮৪-৮৫ সালে পুষ্টিগত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৬ জন বিশ্ব ব্যাংকের মতে এ সংখ্যা শতকরা ৭৭ জন। পুষ্টি দারিদ্র পরিমাপের একটি বিশেষ উপায় মাত্র।

গৃহায়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, পুষ্টি, গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, ইত্যাদি পরিমাপক/সূচক দিয়ে দারিদ্রকে ব্যাপক ও সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমাদের জনসংখ্যা শতকরা ৯১ ভাগেরও বেশি গ্রামের বাসিন্দা। এদের একটি বিশাল অংশেরই দারিদ্র নিত্যসংগী এবং প্রধানত সে কারণেই তারা অপুষ্টিরও শিকার। এদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জন ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি তাদেরকে খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।

১৯৯৩ সালে ব্র্যাক তার নিজস্ব কর্মসূচিভুক্ত গ্র্যামীণ জনগণের ষ্টিগত অবস্তার উপর একটি সমীক্ষা চালায়। এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য হলোঃ গ্রামীণ জনগণের পুষ্টিগত অবস্থা পরীক্ষা করা; আয়, ব্যয় ও জমির মালিকানার সাথে খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টির সম্পর্ক নির্ণয়, পুষ্টিগত দারিদ্রের বিস্তার এবং সর্বোপরি পুষ্টিগত দারিদ্রের উপর পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রয়োজনী তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

জামালপুর জেলার কারোমিপাড়া মুন্সিপাড়া এবং যশোর জেলার মোহনপুর ও চণ্ডীপুর, এ চারটি গামের ৮০টি বাড়ারি ৩৯৫ জনের উপর এই জরিপ চালানো হয়। নমুনাভুক্ত প্রতিটি বাড়ির আয়, ব্যয় ও প্রতিদিনের খাদ্য গহণের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। চাল, অটা, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, শাক-সবজি ও ভোজ্য তেল, এ আট প্রকারের খাদ্য দ্রব্যকে বিবেচনায় রাখা হয়।

পুষ্টিগত দারিদ্র বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। দারিদ্র পরিমাপের এটি একটি পদ্ধতি। একজন মানুষের ন্যুনতম যে পরিমণ মৌলিক খদ্যের প্রয়োজন হয়, তার ক্রয়মূল্যের চেয়ে যদি তার আয় কম তয়, তবে বলা যায় ঐ মানুষটি পুষ্টিগত দারিদ্রের শিকার।

---

[18] Summary of the RED research report entitled “Nutrition and poverty: diets and life style of rural population in Bangladesh” by Krimul Hoq, 1993 November, 20p (Summarized in Bangla by KE Kabir)

জামালপুর ও যশোরের জরিপভুক্ত মানুষ দৈনিক মাথাপিছু গড়ে যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ২১৩০ কিলোক্যালীর খাদ্য গ্রহণ কর থাকে। এর সিংহভাগ আসে চাল থেকে (জামারপুরে শতকরা ৮১ ভাগ, যশোরে ৮২ ভাগ)। জামালপুর ও যশোর এলাকার যথাক্রমে শতকরা ৫ ও ৩ ভাগ আসে আটা থেকে এবং শাক-সব্জি থেকে আসে যথাক্রমে শতকরা ৮.৪ ও ৮ ভাগ।

এ সমীক্ষায় ১৯৯১-৯২ সালের দ্রব্য মূল্যকে ভিত্তি করে ন্যুনতম খাদ্যের (১৯০৩ কিলোক্যালি) মূল্য ধরা হয়েছে মাসিক ৩০৫.০০ টাকা। ফাও (FAO)-এর পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপরোক্ত পুষ্টিগত দারিদ্র রেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, জরিপভুক্ত শতকরা ৬৬ জন মানুষ পুষ্টিগত দারিদ্র সীমার নিচে আছে। এদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন ভূমিহীন এবং ৪৮ জন ০১-৯৯ শতাংশ ভূমির মালিকানাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮৪-৮৫ সালেও একই সখ্যক পুষ্টিগত দরিদ্র মানুষের হিসাব পেয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৯৩ সালেও মানুষের পুষ্টিগত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ভূমিহীন পরিবার গড়ে তাদের আয়ের শতকরা ৭৮ ভাগ চল-গম ক্রয় করার জন্য খরচ করে থাকে। যেসব পরিবারের এক একর পর্যন্ত জমি আছে তারা চাল গমের জন্য আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ, ১-২ এরক পর্যন্ত জমি যাদের আছে তারা ৫৭ ভাগ, ২-৩ একর যাদের আছে তারা ৫৫ ভাগ এবং তিন একরের বেশি যাদের আছে তারা ৫৪ ভাগ খরচ করে থাকে। অর্থাৎ যতই জমির পরিমাণ কমতে থাকে ততই চাল-গমের জন খরচের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং মাছ, মাংস, ডিম ও শাক-সবজির জন্য খরচের পরিমাণ কমতে থাকে।

জরিপে দেখা গেছে যে, জামালপুরে চরম পুষ্টিগত দারিদ্র সীমার নীচে আছে শতকরা ২৩ ভাগ পরিবার। যশোরের এ সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ অর্থাৎ জামালপুরে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশি। ফলাফলে আরও দেখা যায় যে, জমির পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ক্যালরি গ্রহণও বেড়ে যায়।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের একটা বড় অংশ জীবন ধারনের জন্য বিশেষ করে চালের উপর নির্ভর করে থাকে। ফলে তারা খাদ্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। আর্থিক কারণেই তারা সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না। এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিত উন্নয়নের শিক্ষার প্রভাব[19]

মোঃ নজরুল ইসলাম, ফজলুল করিম, জিয়াউদ্দিন হায়দার, এফ এম কামাল ও মোঃ মহসীন

পটভুমি

ব্র্যাকের 'মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির পাঁচটি প্রকল্পের একটি হচ্ছে কিশোরীদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কর্মসূচি। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে এত অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের সাক্ষরতা ও সাধারণ অংক বা সংখ্যা গণনা সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানো। সাথে সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক বিষয়সমূহে তাদের সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি করা। একইসঙ্গে এটাও আশা করা হয় যে, এ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা কোন এক সময়ে এ প্রকেল্পর কর্মী হিসেবে কাজ করবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক এ কর্মসূচির আওতাধীন দশটি থানা এক হাজার স্কুল চালু করে। এসব ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে তাদের শিক্ষাক্রম শেষ করেছে।

ব্র্যাকের এ শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সমীক্ষাটি চালায়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও তাদের কল্যাণে ছাত্রীদের ভূমিকার উপর উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম শেষ করা কিশোরীদের কার্যকর প্রভাব কতটুকু তা লক্ষ্য করা এ সমীক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়াও নিরাপদ মাতৃত্ব ও সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে এনএফপিই স্কুলের ছাত্রী, তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণী মান পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া এবং যারা কখনোই স্কুলে যায়নি এ রকম তিন ধরনের মেয়েরা কতটুকু সচেতন তা পর্যালোচনা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এদের খানার অন্যান্যরা যে সব স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা ভোগ করছে তার উপযোগিতার স্তর নির্ধারণ ইত্যাদি।

এগার থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী তিন পর্যায়ের কিশোরী এবং তাদের পরিবারগুলো উপর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালানো হয়। এ তিন ধরনের মেয়েদের মধ্যে রয়েছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করা মেয়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক স্কুলের ছাত্রী যারা ২য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কোর্স শেষ করেছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে সেই সব মেয়ে যারা কোন দিনই স্কুলে যায়নি। এই সমীক্ষার অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সে ভালো করেছে এমন কিছু মেয়ের উপর কিছু কিছু কেইস স্টাডিও করা হয়েছে।

এ সমীক্ষার জন্য চারটি এলাকা থেকে ১৩টি করে মোট ৫২টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি গ্রাম থেকে ১১-১৪ বছরের কিশোরী রয়েছে এমন ৬টি খানাকে সমীক্ষার আওতায় আনা হয়। এভাবে ৩১২টি খানার উপর ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমীক্ষা চালিয়ে এসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

সমীক্ষার দেখা দেছে, এনএফপিই স্কুলে ৬৩টি এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলে যাওয়া ৬৪টি মেয়ের খানার সদস্যরা কোন না কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বেশির ভাগ খানাই ব্র্যাকের গ্রাম সমিতির

---

[19] Summary of the RED research report entitled "Effect of education on health, nutrition and overall development: a case of BRAC's NFPE in WHDP" by Md. Nazrul Islam, et. al., 1993 December, 46p. (Summarized in Bangla by Quazi Faruque)

সঙ্গে জড়িত। আরো দেখা গেছে, এনএফপিই স্কুলে পড়া মেয়েদের খানার ৭১% ভূমিহীন, আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে ৬৫.৪% এবং কখনো স্কুলে যায়নি তাদের ক্ষেত্রে ৮১%। এনএফপিই স্কুলে পড়া মেয়েদের খানার গড় জমির পরিমাণ ৬.৯ শতাংশ। এ হার যারা আনুষ্ঠানিক স্কুলে যায় এমন খানার ক্ষেত্রে ১০.২ শতাংশ এবং যারা একেবারেই স্কুলে যায় না সে ক্ষেত্রে ৩.৯ ডেসিমেল। বেশির ভাগ খানায় সদস্যরাই দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের অনেকেই ভ্যান বা রিক্সা চালক।

আরো লক্ষ্য করা গেছে, এনএফপিই স্কুলে ছাত্রীদের খানা প্রধানদের প্রায় ৮৬% অশিক্ষিত। আনুষ্ঠানিক স্কুলে মেয়েদের পড়তে দেয়া খানা প্রধানদের ৬৭% এবং কখনো স্কুলে যায় না এমন খানার মেয়েদের ৯৩.৩% অভিভাবক অশিক্ষিত। স্কুলে না পড়া মেয়েদের পরিবার প্রধানদের মাত্র ৫.৮% পরিবার প্রধান প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে। তবে মেয়েদের এনএফপিই স্কুলে পড়তে দেয়া পরিবার প্রধানদের ৯.৬% এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের পরিবার প্রধানদের ১৯.৩% এর উলে্লখিত পর্যায়ের শিক্ষা-দীক্ষা আছে।

মৌলিক যোগ্যতা সংক্রান্ত জ্ঞান

আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া ছাত্রী এবং কখনোই কোন স্কুলে যায়নি এমন মেয়েদের তুলনায় ব্র্যাক স্কুলের ছাত্রীদের মৌলিক জ্ঞানের তফাত অনেক বেশি। এনএফপিই কোর্স সম্পন্নকারী মেয়েদের ৯৭%, আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের ৮৪.৬% এবং অশিক্ষিত মেয়েদের ৪৯% জানে যে, বন্যার সময় পানি ফুটিয়ে পান করতে হয়। অধিকাংশ মেয়েই ডায়রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে লবণ গুড়ের শরবতের কথা উলে্লখ করেছে। এদের মধ্যে ৯৩.৩% এনএফপিই ছাত্রী, ৮৪.৬% আনুষ্ঠানিক স্কুলের ছাত্রী এবং ৭৭.৯% কখনোই স্কুলে যায়নি।

অশিক্ষিত মেয়েদের ৫৩.৮% জানে যে, মলত্যাগের পর ছাই বা সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়। তবে আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের ৮৫.৬% এবং ব্র্যাক স্কুলের ৯৯.১% এ কথা জানে।

পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান

ব্র্যাক স্কুলের প্রায় ৭৭% ছাত্রী বলেছে সবুজ শাক-সবজী খেলে রাতকানা রোগ হয় না। সেখানে আনুষ্ঠানিক স্কুলের ৫৩.৮% এ কথা জানে। আর কখনোই যারা স্কুলে যায়নি এদের মাত্র ১৬.৩% মেয়ের এ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে।

গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে অধিকাংশ কিশোরীই অজ্ঞ। দেখা গেছে, ব্র্যাক স্কুলের ১৮.৩% মেয়ে জানে যে, আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে গলগণ্ড রোগ হয় না।

শিশু পরিচর্যা

ব্র্যাক স্কুলের অধিকাংশ কিশোরীরা (৬৫.২%) জানে যে, সদস্যজাত শিশুকে জন্মের পরপর মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। অথচ আনুষ্ঠানিক স্কুলের কিশোরীদের ৪১.৩% এবং অশিক্ষিত মেয়েদের ২১.১%

এ তথ্যটি জানে। কোনদিন স্কুলে যায়নি এমন কিশোরীদের ৫০%, আনুষ্ঠানিক স্কুলের ১৮.৩% এবং ব্র্যাক স্কুলের ১০.৬% বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক সময় সম্পর্কে জানে না। ব্র্যাকে স্কুলের ৭৪% ও অশিক্ষিত কিশোরীদের ১৮.৩% জানে যে, শাল দুধ সদ্যজাত শিশুর জন্য একটি পুষ্টিকর খাদ্য। অশিক্ষিত মেয়েদের ৭৮.৮% শাল দুধের উপকারিতা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

নিরাপদ মাতৃত্ব ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান

অধিকাংশ মায়েরাই জানেন যে, দু'টি সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়টা (অর্থাৎ জন্ম বিরতিকরণ) পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে এবং কখনোই স্কুলে না যাওয়া মায়েদের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ জানেন যে, দু'টি সন্তানের মাঝে কমপক্ষে তিন বছরের ব্যবধান থাকা উচিত। আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মায়েদের ২৬.৯% একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের প্রায় অর্ধেক, আনুষ্ঠানিক স্কুলের ৪২.৩% এবং অশিক্ষিত মেয়েদের ১৩.৫% পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে। তবে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে অল্প সংখ্যক মেয়েই অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত, অপর দিকে অশিক্ষিত মেয়েদের ৮০% এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের প্রায় ৫০% এ সম্পর্কে কিছুই জানে না।

শিশু দৈহিক বৃদ্ধি মনিটরিং

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের ১০৪ জনের মধ্যে ৭৭ জন মায়েদের শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি মনিটরিং সেশনে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ মেয়েই (৮৭.৫%) জানে যে, শিশুর ওজন পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ এ থেকে শিশুর শারীরিক হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জানা যায়। এ থেকে শিশুর ওজন বাড়ছে না কমছে তাও জানা যায়। মায়েদের একটা বিরাট অংশ শিশুর ওজনের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।

পায়খানার ব্যবহার

অশিক্ষিত এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের এক চতুর্থাংশ পিট পায়খানা ব্যবহার করে। কিন্তু উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে অংশ নেয়া মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ হার আরো বেশি (৪২.৩%)। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে মেয়েদের মাত্র ৫%, প্রচলিত স্কুলে পড়া মেয়েদের ১৬% এবং কখনো স্কুলে না যাওয়া মেয়েদের পরিবারে সদস্যদের মাত্র ৩% স্ল্যাব পায়খানা ব্যবহার করে।

স্বাস্থ্য সেবা জ্ঞান

আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের মায়েরা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে পড়া মেয়েদের মায়েরা এবং কখনো স্কুলে না পড়া মেয়েদের মায়েদের তুলনায় ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সম্পর্কে বেশি জানেন। তিন শ্রেণীর

মায়েদের মধ্যে মাত্র ১১-১৭.৩% মা ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায় বলে উলেখ্য করেছেন।

টিটেনাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত জ্ঞান

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম ও আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের অধিকাংশই (৮০% - এর উপর) বলেছে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের মেয়েদের টিটেনাস প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যেতে পারে। অথচ অশিক্ষিতদের মদ্যে ৫৯.৬% এর এ জ্ঞান রয়েছে। উপরন্তু তাদের ৪০.৪% টিটেনাস ভ্যাকসিক কি তা জানেন না।

শিশুদের টীকাদান সংক্রান্ত জ্ঞান

শিশুদের টীকা দেয়ার মাধ্যমে ছয়টি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব এ কথা এনএফপিই ও আনুষ্ঠানিক স্কুলের খানার সদস্যরা যতটা জানে কখনো স্কুলে না যাওয়াদের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান খুবই সীমিত। উপ-আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক স্কুলের মেয়েদের দু'তৃতীয়াংশ ডিপিটি ভ্যাকসিন সম্পর্কে জানে।

গর্ভবতী ও বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের খাদ্য

অন্য মায়েদের তুলনায় ৮ মাসের গর্ভবতী ও শিশুকে বুকের দুধ দেয় এমন মায়েদের কেন বেশি খাবার দেয়া প্রয়োজন এ সম্পর্কে তিন শ্রেণীর মাঝে বেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। কখনোই স্কুলে না যাওয়া মেয়েদের মায়েদের শতকরা ৭৫%, এনএফপিই'র ৮১.৭% এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া মেয়েদের মায়েদের ৯০.৪% জানেন যে, সাধারন মায়েদের তুলনায় গর্ভবতী মায়েদের বেশি খাবার দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

মেয়েদের বিয়ে

এ বিষয়ে এনএফপিই, আনুষ্ঠানিক স্কুলে ও কখনো স্কুলে না যাওয়া মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যথাক্রমে ৩৮.৫%, ৫০% ও ২২.১% মনে করেন মেয়েদের বিয়ের সঠিক বয়স হওয়া উচিত কমপক্ষে ২০ বছর। তবে এ তিন শ্রেণীর মধ্যে আবার একটা বিরাট অংশ ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার

৬ থেকে ৭১ মাস বয়সী শিশুদের অধিকাংশই (৬৯.৮%) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেয়েছে। এ হার এনএফপিই'র ক্ষেত্রে ৭৪.২%, আনুষ্ঠানিক স্কুলের ক্ষেত্রে ৭৮% এবং কখনো স্কুলে না যাওয়া মেয়েদের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫৬.৪%।

উপসংহার

সমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, কিশোরীদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে খুবই ইতিবাচক সাড়া জুগিয়েছে। এই শিক্ষাক্রম অনেকাংশেই প্রায়োগিত ও জীবনমুখী। এবং তা হাতে-কলমে শিখতে ও বুঝতে ছাত্রীদের উৎসাহিত করে। অপরদিকে কখনোই বিদ্যালয়ে না যাওয়া মেয়েদের তুলনায় আনুষ্ঠানিক স্কুলের মেয়েরা উল্লেখযোগ্যভাবে অধিকতর জ্ঞানার্জন করেছে। তবে এটাও স্পষ্ট যে, অশিক্ষিত মেয়েরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সুযোগ পায়নি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক স্কুলের মেয়েরো তা পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত মেয়েদের জ্ঞানের স্তর এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া খুবই দুর্বল। আবার উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের মেয়েরা আনুষ্ঠানিক স্কুলের মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী।

দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নিম্ন পর্যায়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগকে বেছে নেয়াই কি উত্তম?[২০]

ফজলুল করিম, শাহ নূর মাহমুদ, আহমেদ আলী, নজরুল ইসলাম ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

সুস্বাস্থ্য সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি চাবিকাঠি। ব্যাক মনে করে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে স্বাস্থ্য কেন, অন্য কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। কারণ, গ্রামাঞ্চলের গরীব জনগণই বেশি অস্বাস্থ্য ও অপুষ্টির শিকার। এখানে বেশিরভাগ পরিবারগুলোতে জন্মহার বেশি। এসব পরিবারগুলিতে যেসব শিশু জন্ম নেয় তাদের অধিকাংশই অপুষ্টির শিকার। উপরন্তু, শহরাঞ্চলের চেয়ে পল্লী এলাকায় একজন মহিলার সার্বিক প্রজনন হার বেশি। এ হার যথাক্রমে শতকরা ২.৯ ও ৪.৬। আর এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পল্লী এলাকার জনগণের মাঝে কম সাড়া জাগাতে পেয়েছে। এসব কারণে মায়েরা ভোগেন পুষ্টিহীনতায় ও রক্তশূন্যতায় এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়ে সদ্যজাত শিশুর উপর।

আমাদের দেশে বছরে প্রায় পাঁচ লাখ শিশু জন্মের পরপরই মারা যায়। পাঁচ বছর বয়স না হতেই মারা যায় প্রায় তিন লাখ শিশু। তবে গ্রামের তুলনায় শহরে শিশু মৃত্যুর হার কম।

আশপাশের দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রসূতি মৃত্যুর হারও সর্বোচ্চ পর্যায়ে, প্রতি হাজারে ৬ জন (বছরে মোট ২৩,০০০ জন)। অথচ শ্রীলঙ্কায় এই মৃত্যু হার হাজারে একজন। এছাড়াও দেখা গেছে, বছরে ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায় এবং এর মূল কারণ ভিটামিন 'এ'-এর অভাব। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, শহরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধা পেতে আগতদের শতকরা ৩২ ভাগ নারী ও ২১ ভাগ শিশু। পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৪৭ ভাগ। দেখা গেছে, সরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলো থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ লোক চিকিৎসা সুবিধা পায়। ব্র্যাক ও অন্যান্য সংস্থার গবেষণা রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের ধনিক শ্রেণীই স্বাস্থ্য সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। আর যারা গরীব, যাদের স্বাস্থ্য সেবার বেশি প্রয়োজন। তারাই থেকে যায় অবহেলিত ও বঞ্চিত। তাই এদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে 'মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি' (ডবুউএইচডিপি) নামে একটি কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ১০টি থানার প্রায় ১৭ লাখ মানুষ। এদের অর্ধেকেরও বেশি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের, এবং এটাই হচ্ছে এই কর্মসূচির অভীষ্ট জনগোষ্ঠী বা Target Group (TG)।

উক্ত কর্মসূচির পাঁচটি অঙ্গ প্রকল্পের মধ্যে সমন্বিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প বা কম্প্রিহেনসিভ হেলথ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিএইচডিপি) সবচেয়ে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রকল্পের অধীনে অনেক ধরনের কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেমন (ক) সরকার পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত টিকাদান ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণে সহায়তা দান, (খ) পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ

---

[20] Summary of the RED research report entitle "Targeting the bottom fifty percent: is it a better approach to promote health service utilization among the poor?" by Fazlul Karim, et. al., 1993 November, 23p. Also published in Grassroots 1995; 5(17):44-56. (Summarized in Bangla by Quazi Faruque).

করা, (গ) বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, (ঘ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার প্রসার, এবং সেই সঙ্গে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের সুবিধা গ্রহণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, (ঙ) যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ, (চ) যে সব গ্রামে সরকারি স্যাটেলাইট ক্লিনিক নেই সেসব গ্রামে প্রসব-পূর্ব ক্লিনিকের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের সেবা দান এবং (ছ) শিশুদের নিউমোনিয়া রোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগের চিকিৎসা, ইত্যাদি। এছাড়াও মহিলাদের নিয়ে পল্লীস্বাস্থ্য কমিটি গঠন, গ্রামীণ দাই ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ করার জন উপযুক্ত মহিলাদের (ডিপোহোল্ডার) প্রশিক্ষণ দেয়াও সমন্বিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন।

সমীক্ষা

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ এবং কমিউনিটি এপ্রোচের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালায়। উক্ত সমীক্ষার জন্য কমিউনিটি এপ্রোচের নমুনা নেয়া হয় ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির এলাকা থেকে যেমন, ঘিওর, সাটুরিয়া, সাঁথিয়া ও রংপুর সদর থানা। অপরদিকে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের নমুন নেয়া হয় ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির এলাকা থেকে। যেমন, ত্রিশাল, পার্বতীপুর, ও গোবিন্দগঞ্জ থানা। বহুমাত্রিক নমুনা চয়ন পদ্ধতিতে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের উপরোক্ত তিনটি থানা থেকে মোট ৬৩০টি খানা এবং কমিউনটি এপ্রোচের ৪টি থানা থেকে ২,৩৫৬টি খানা উক্ত সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক কমিউনিটি এপ্রোচের মাধ্যম মোট ৬টি থানায় (যথা, মানিকগঞ্জ সদস, সাঁথিয়া, ঘিওর, সাঁটুরিয়া, রংপুর সদর ও তারাগঞ্জ) ১৯৮৬ সাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (পিএইচসি) চালিয়ে আসছে। পরে ১৯৯১ সালে ঐসব এলাকাকে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সমন্বিত করা হয়। স্মরণীয় যে, উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি ফলাফল যাচাই করার জন্য ১৯৮৯ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। অত্র সমীক্ষায় সেই সমীক্ষার তথ্যকে কমিউনিটি এপ্রোচের তথ্য হিসেবে টার্গেট এপ্রোচের (ডব্লিউএইচডিপি) সাথে তুলনা করা হয়।

ফলাফল

সমীক্ষায় দেখা যায়, টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ, মহিলাদের টিকা গ্রহণ ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর ক্ষেত্রে NTG-র চেয়ে TG-র হার বেশি। তবে শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে TG ও NTG দের খুব একটা পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে কমিউনিটি এপ্রোচে মহিলাদের টিকা নেয়া, শিশুদের টিকাদান ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের ক্ষেত্রে NT দের চেয়ে NTG দের হার বেশি। তবে জন্মনিয়ণের ক্ষেত্রে TG এবং NTG দের হার সমান।

টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচে স্লাব ল্যাটিন, হাড়িপাতিল ধোয়া, গোসলের জন্য নলকূপের পানি ব্যবহার এবং মল ত্যাগের পর ছাই বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়র ক্ষেত্রে TG দের চেয়ে NTG দের হার বেশি। তবে পিট ল্যাট্রিন ব্যবহার ও নলকূপের পানি পানের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য নেই।

মহিলা ও শিশুদের টিকাদান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের TG দের অবস্থা কমিউনিটি এপ্রোচের TG দের চেয়ে ভাল। তবে বিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাল নয়।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভাল নয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের NTG দের অবস্থা কমিউনিটি এপ্রোচের NTG দের চেয়ে ভাল।

স্যানিটারি ল্যাট্রিন, এবং গোসলের জন্য নলকূপের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের TG দের অবস্থা কমিউনিটি এপ্রোচের NTG দের চেয়ে ভাল কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাল নয়।

দেখা যায়, টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের জন্মনিয়ন্ত্রণ, মহিলা ও শিশুদের টিকাদান এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের ক্ষেত্রে NTG দের চেয়ে TG দের অবস্থা ভাল। পক্ষান্তরে, কমিউনিটি এপ্রোচে মহিলাদের টিকা গ্রহণ, শিশুদের টিকা ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের ক্ষেত্রে NTG দের অবস্থা TG দের চেয়ে ভাল।

আলোচনা ও উপসংহার

দরিদ্র জনগণের কাছে সহজে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ অধিকতর কার্যকরী অনুভূত হওয়ায় ব্র্যাক গ্রামীণ এলাকার ভূমিহীন দরিদ্র জনগণের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে স্বাস্থ্য বিষয়ক এই এপ্রোচ গ্রহণ করেছে।

এ সমীক্ষায় দেখা গেছে, কমিউনিটি এপ্রোচের TG দের তুলনায় টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের TG দের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল। টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ দ্বারা TG দের মাঝে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের হার উন্নয়ন সম্ভব। এ সমীক্ষা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা দিতে পেরেছে।

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, কতিউনিটি এপ্রোচের চেয়ে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ বেশি কার্যকরী।

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন[21]

ফজলুল করিম

পটভূমি

১৯৮৬ সালের শেষের দিকে ব্র্যাক ৬টি থানায় (মানিকগঞ্জ সদর, সাঁটুরিয়া, ঘিওর, সাঁথিয়া, রংপুর সদর ও তারাগঞ্জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির শুরু করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই সেবা প্রদান করা হতো। উক্ত কর্মসূচির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্র্যাক প্রতিটি গ্রামে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করে। এতে সমাজের ধনী-গরীব পুরুষ ও মহিলাদের সদস্য/সদস্যা বানানো হতো, প্রত্যাশা ছিলো যে ঐসব কমিটির সদস্য/সদস্যাগণ কর্মসূচির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন এবং সেবা গ্রহণসহ বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় অংশ নেবেন এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির সাফল্য পরিমাপ করার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৮৯ সালে দু'টো সমীক্ষা চালায়। প্রথম সমীক্ষা দ্বারা উপরোক্ত ৫টি থানা থেকে নমুনায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের হার যাচাই করা হয়। এবং দ্বিতীয় সমীক্ষা দ্বারা ঘিওর থানার বাষ্টিয়া এবং পুরানগ্রামের গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটিগুলোর মাধ্যমে কি পরিমান জনগণের অংশগ্রহণ অর্জিত হয়েছে তা দেখা হয় প্রথম জরিপের ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় সমীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ পাওয়া যায়নি। জনগণের অংশগ্রহণ আশানুরূপ না হওয়ার পিছনে দৃশ্যত বহুমুখী কারণ বিদ্যমান ছিলো। এগুলোর মধ্যে মূখ্য ছিলো জনগণের ব্যাপক দারিদ্রতা। অবশেষে জনগণের অংশগ্রহণকে ব্যাপকতর এবং অব্যাহত রূপ দান করার প্রয়াসে উপরোক্ত থানাগুলোর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিকে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে ১৯৯১ সালে একীভূত করা হয়। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ, ঋণ, ইত্যাদি দানের মাধ্যমে গরীবদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। তাই সঙ্গত কারণে ১৯৯১ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্য রেখে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটিগুলোর পুনর্বিন্যাস করতে হয়। ফলশ্রুতিতে, গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি থেকে পূর্বের ধনীদেরকে বাদ দিতে হয় এবং গরীবদের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এভাবে আরডিপি'র সাথে একীভূত অবস্থায় প্রায় ২ বছর কাজ করার পর গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটিগুলোর কি হাল হলো, এগুলোর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি কতটুকু লাভ করলো, ইত্যাদি যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো জানার জন্য ঘিওর থানার বাষ্টিয়া এবং গুরানগ্রামে ১৯৯৩ সালের মে মাসে একটি ফলো-আপ সমীক্ষা চালানো হয়। উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৮৯ সালে এ গ্রামগুলোতে জনগণের অংশগ্রহন পরিমাপ করার জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল যাতে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। তবে বাষ্টিয়ার অবস্থা পুরানগ্রামের চেয়ে তখন ভাল ছিল।

---

21 Summary of the RED research report entitled "Development of Village Health Committee for Community Participation in PHC: investigation about the present status of the strategy" by Fazlul Karim. 1993, July 32p (Summarized in Bangla by AKB Rahman)

ফলো-আপ সমীক্ষার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ লক্ষ্যে বাষ্টিয়ার গ্রাম কমিটির পুরানো সদস্য/সদস্যা এবং পুরানগ্রামের বর্তমান এবং অতীতের সদস্য/সদস্যাদের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করা হয়। এছাড়া উক্ত গ্রামগুলোতে কর্মরত ব্র্যাকের মাঠকর্মী এবং প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপকদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের তুলনামূলক বিচারের জন্য ১৯৮৯ সালে ৫টি থানায় পরিচালিত সার্ভিস কভারেজ জরিপের ফলাফলের সাথে ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক নিয়মিতভাবে পরিচালিত জনমিতিক সার্ভিল্যান্সের রেকর্ডকৃত নির্ধারিত স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক তথ্যের তুলনা করা হয়। যাহোক, এখানে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটির মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ বোঝাতে বিভিন্ন বিষয় যেমন, উক্ত গ্রামগুলোতে সক্রিয় গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি আছে কিনা, জনগণ কি মাত্রায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহার করছে, জনগণের মধ্য থেকে কোন স্বাস্থ্য সেবিকা বা ক্যাডার প্রশিক্ষণ পেয়ে গ্রামে কাজ করছে কিনা, সেবার বিনিময়ে কোন খরচ আদায় করা হয় কিনা, ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

ফলাফল

১৯৯১ সালে আরডিপি'র সাথে একীভূত করার ৯ মাস পরে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুরানগ্রামের গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটিকে পুনর্বিন্যাস করে চালু করা হয়। অপরদিকে, বাষ্টিয়ার গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি উক্ত প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই স্থগিত রাখা হয় এ ব্যাপারে ব্র্যাক কর্মী বাষ্টিয়ার পুরানো স্বাস্থ্য কমিটির সদস্য/সদস্যাদের সঙ্গে সার্থক যোগাযোগ এবং ব্র্যাকের কার্যকরী উদ্যোগের অবাবই দায়ী বলে জানা গেছে। একজন পুরানো সদস্যের উক্তি থেকে এটা পরিস্কার হবে। তিনি বলেন, "আগে (অর্থাৎ আরডিপি আসার আগে) ব্র্যাকের কর্মীরা আমাদের কাছে আসতেন, আমাদের সাথে বসে গ্রামের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতেন এবং জনগণকে বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এখন ব্রাকের কর্মীরা সাইকেল বা মটর সাইকেলে আমাদের গ্রামে আসেন। আমরা তাদের মধ্যে একটি বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি। তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে আমাদের সাথে মোটেই আলাপ করেন না বরং আমাদেরকে উপেক্ষা করে চলেন। এটা কি অসন্তোষের ব্যাপার নয়?"

ব্র্যাক আরডিপির তৎপরতা হিসেবে এর অভীষ্ট জনগণকে নিয়ে উভয় গ্রামেই পুরুস ও মহিলা দল গঠন করা হয়। পুরানগ্রামে একজন স্বাস্থ্য সেবিকাকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিন্তু বাষ্টিয়াতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। ব্র্যাকের সংশিষ্ট মাঠ কর্মী এবং প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণ বলেছেন যে, আরডিপি'র কৌশলগত কারণে বাষ্টিয়ার গ্রাম কমিটিকে স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে পরে এটাকে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

উভয় গ্রামেই স্যাব ল্যাটিন এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাত্রা উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শিশুদের প্রতিষেধক টিকা, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ইত্যাদি ব্যবহারের হার কমেছে। সরকারি সংশিষ্ট কর্মীদের কাজে অনিয়ম এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অভাবের জন্য টিকা এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের ব্যবহার কমে গেছে বলে মনে হয়।

বাষ্টিয়ার তুলনায় গুরানগ্রামে একমাত্র পিট ল্যাট্রিন স্থাপন বাদে অন্যান্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের হার উলেখযোগ্যভাবে বেশি। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার গুরানগ্রামে বাষ্টিয়ার চেয়ে প্রায়

দুইগুণ বেশি (৮১%)। এতো গেলো গ্রামভিত্তিক তুলনা। এখন দেখা যাক, আরডিপি'র গ্রাম সংগঠনের সদস্য/সমস্যাদের অবস্থা।

১৯৮৬-১৯৯০ মেয়াদের চেয়ে ১৯৯১-১৯৯৩ মেয়াদে বাষ্টিয়া এবং পুরানগ্রামের গ্রাম সংগঠনভুক্ত খানাতে সংগঠন বহির্ভূত খানার তুলনায় পিট বা স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপনের হার উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (বাষ্টিয়া ২২.৭% এবং পুরানগ্রাম ২৭.৬%)। গ্রাম সংগঠন বহির্ভূত খানায় একটা বৃদ্ধি পেলেও তা সংগঠনভুক্ত খানার তুলানায় অনেক কম। তবে পিট বা স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপনের হার পুরানগ্রামে বাষ্টিয়ার চেয়ে বেশি ছিলো। এমনকি উভয় গ্রামের সামগ্রীক জনগণকে নিয়ে অর্থাৎ সংগঠনভুক্ত এবং বহির্ভূত খানাগুলো তুলনা করেও দেখা গেছে যে, পিট বা স্ল্যাব ল্যাট্রিনের হার পুরানগ্রাম বেশি (পুরানগ্রাম ৪২% এবং বাষ্টিয়া ৩৯%)। সম্ভবতঃ গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটির উপস্থিতি এবং তৎপরতার দরুন বিভিন্ন সেবা ব্যবহারের হার পুরানগ্রামে বাষ্টিয়ার চেয়ে বেশি হয়েছে।

১৯৮৬-১৯৯০ সালে ব্র্যাক সব ধরনের সেবাই বিনামূল্যে প্রদান করতো। কিন্তু আরডিপির'র সাথে একীভূত করার পর সেবার বিনিময়ে সামান্য খরচ উসুলের প্রক্রিয়া চালু করা হয়। ব্র্যাক সাধারণ রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর স্টক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবিকাদের বাড়িতে। ব্র্যাক খোলা বাজার থেকে নির্দিষ্ট ঔষধ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য খাবার বড়ি ও কনডম কিনে সেবিকাদের কাছে নিয়মিত বিতরণ করে থাকে। আর সেবিকারা তা জনগণের কাছে নামমাত্র লাভ নিয়ে বিক্রি করে থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, একজন সেবিকা খাবার বড়ি ০.৭৫ টাকায় নিকে ১.৫০ টাকায় বিক্রি করে থাকেন। তাছাড়া সাধারণ রোগে ঔষধ তিনি ১০% লাভে বিক্রি করেন। উপরন্তু, যে সকল রোগী তার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আসে তাদের থেকে গ্রাম সংগঠন সদস্য/সদস্যা হলে মাথা পিছু ২ টাকা এবং সংগঠন বহির্ভূতদের থেকে মাথাপিছু ৫ টাকা পরামর্শ ফি হিসাবে আদায় করে থাকেন। অন্যদিকে রোগীর বাড়ি গেলে তিনি প্রতিটি সংগঠনভুক্ত রোগী থেকে ৫ এবং সংগঠন বহির্ভূত রোগী থেকে ১০ টাকা হারে পরামর্শ ফি নিয়ে থাকেন। এসব টাকা তিনি নিজেই ভোগ করেন। যাহোক, একজন সেবিকার ভাষ্য মতে, তিনি মাসিক গড়ে এ বাবত প্রায় ৫০-৬০ টাকা আয় করেন। সেবার বিনিময়ে খরচ উসুলের মাত্রা নামমাত্র মনে হলেও এটা কর্মসূচির আর্থিক দিক জোরদারর পথে একটি বড় পদক্ষেপ। যেখানে সরকারি খাতে সম্মপূর্ণ বিনামূল্যে এসব সেবা প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে সামান্য হলেও এটা একটা বড় প্রয়াস বলে আমাদের ধারণা। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কোন দেশে উক্ত সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে এরূপ কর্মসূচিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই আর্থিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সেবার বিনিময়ে খরচ উসুল প্রক্রিয়া জোদার হওয়া দরকর। আমাদের বিশ্বাস, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে এ সক্ষেত্রে আরো উন্নতি ঘটবে।

১৯৮৬-৯০ এই চার বৎসরে পলী স্বাস্থ্য কমিটি পরিচালনার অভিজ্ঞার আলোকে স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার স্বার্থে পলী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে একীভূত করা হয়। উলেখ্য যে, এই গ্রামগুলোতে ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ সময় ধনী-গরীব সবাই এতে যোগ দেবার যোগ্য ছিলো। কিন্তু RDP শুধু গরীবদের নিয়ে কাজ করে। এতে বোঝা যায় যে, দু'টো কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্য ভিন্ন। সুতরাং দীর্ঘ দিন ধরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি দ্বারা লালিত গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটিগুলো কিভাবে RDP-র প্রক্রিয়ার সাথে সমঝোতা সাপেক্ষে একীভূত করা যায় তা লক্ষণীয়। এগুলোক RDP-

র সাথে একীভূত করার আগে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিলে পুনর্বিন্যাস কাজ ত্বরান্বিত হতো। ভবিষ্যতে মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্বও পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। সে ক্ষেত্রেও মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্তৃক সৃষ্ট গ্রাম কমিটির স্থায়িত্বি বা পরিবর্তনের জন্য সুষ্ঠুভাবে চিন্তার মাধ্যমে বাস্তব সিদ্ধান্তের প্রয়োজন আছে।

প্রতিষ্ঠিত সূচকের আলোাকে পুরানগ্রামে যে পল্লী স্বাস্থ্য কমিটিটি চালুও আছে তাতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে। এ গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটিটি তাদের নিজস্ব নেতৃত্বের মাধ্যমে (অবশ্য ব্র্যাকের পূর্ণ সহযোগিতায়) একজন স্বাস্থ্য সেবিকা ও একজন দাই-এর সহায়তায় পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বেশ ভালই কাজ করে যাচ্ছে। এ গ্রামে বাষ্টিয়ার তুলনায় বিভিন্ন সেবা ব্যবহারের হার বেশি। এমনকি জনগণের অংশগ্রহণের সবচেয়ে জোরালো সূচক সেবার বিনিময়ে খরচ উসুলও আংশিকভাবে চালু করেছে এমন সব খাতে যেগুলি সরকারিভাবে বিনামূল্যেই পাওয়া যায়।

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যদি গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি এবং এর সাথে জড়িত স্বাস্থ্য সেবিকা ও দাইগণ সুষ্ঠু ও সুনিয়তিন্ত্রতভাবে কাজ করে তবে টেকসইভাবে জনগণের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করা যায়। এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন দক্ষ স্বেচ্ছাসেকব/ সেকিবাদের যথাযথ উৎসাহ দেয়া। তবে এ উৎসাহকে অবশ্যই হতে হবে কার্যনির্ভর।

তাগিদ

এ সমীক্ষায় গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটির বৃহত্তর জনগণের অংশগ্রহণসহ কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, বাষ্টিয়ার পল্লী স্বাস্থ্য কমিটিকে পুনরুজ্জীবিত করা ঔষধ ক্রয়ের জন্য বৃহত্তর জনগণের অংশগ্রহণের খাতিরে কিছু চাঁদা আদায় করা বা অন্য কোন লাগসই উপায়ে অর্থ উঠান, মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি ও পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির একীভূত করার পুর্বে সুষ্ঠুনীতি নির্বাচন করা, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে পল্লী স্বাস্থ্য কমিটির সদস্যদের পূর্ণভাবে জড়িত করা, স্বাস্থ্য সেবিকাদের যথাযথ নথী সংরক্ষণ করা, এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কী এ কর্মসূচির কাজকে বোঝা মনে করে?[২২]

কাওসার আফসানা, সৈয়দ মাসুদ আহমদ, মালিহা মঈদ, রীতা দাশ রায় ও ফজলুল করিম

আমাদের দেশের গ্রামীণ মহিলারা সারাটা দিন কত কাজ করে তার কোন হিসাব নেই। ফজরের সময় থেকে শুরু করে গভীর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যস্ত থাকতে হয় সাংসারিক নানা কাজে। এর বাইরেও দু'মুঠো খাবারের জন্য তাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করতে হয়। বলতে গেলে অবসরহীন ব্যস্ত জীবন তাদের। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামের একজন মহিলা দিনে ১৪ থেকে ১৮ ঘন্টা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। তাতেও যদি তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা আসত।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্র্যাকের 'মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির' কাজে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের জন্য এ কর্মসূচির কাজ বোঝা কিনা তার উপর গবেষণা করা আবশ্যক হয়ে দাড়ায়। এ কর্মসূচিটি প্রণয়ন করা হয়েছিল ১৯৯১ সালে। মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে শিশু ও মহিলাদের পুষ্টিগত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা মোট ১০টি থানায় এ কর্মসূচির চালু করা হয়। মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহলিাদের মহিলা সভা, গ্রাম কমিটি, গ্রাম সংগঠন ও স্বাস্থ্য সেবার কাজে জড়িত থাকতে হয়।

গবেষণার জন্য মহিলাদের চারটি গ্রুপ থেকে নির্বাচিত করা হয়। গ্রুপগুলো হচ্ছে – মহিলা সভা, গ্রাম কমিটি, স্বাস্থ্য সেবিকা ও গ্রাম সংগঠন। যেহেতু এ চারটি গ্রুপের উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে সে জন্য গ্রুপগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

মহিলা সভাঃ গ্রামের প্রতিটি মহিলা এর সদস্যা। প্রতি তিনমাস অন্তর মহিলা সভার ৫-৬ জন সদস্য নিয়ে একটি সভা হয়। টো মূলত: একটি শিক্ষা ফোরাম। এ ফোরামে মহিলাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনার উপর শিক্ষা দেয়া হয়।

গ্রাম কমিটিঃ এ কমিটি গঠিত হয় ৮-১১ জন সদস্য নিয়ে। এ কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় বসে। স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কাজে মহিলাদের স্বাবলম্বী করাই এ কমিটির উদ্দেশ্য।

গ্রাম সংগঠনঃ এ সংগঠন ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এটি মূলত: অর্থোপার্জনের জন্য গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের একটি প্রাথমিক সংগঠন। সপ্তাহে একবার সভা বসে। ইস্যু ভিত্তিক সভা হয় মাসে একবার।

---

[22] Summary of the RED research repor entitle "Women, workload and Women's Health Development Programme: are women overburdened?" by Kaosar Afasna et. al., 1993 November, 62p (Summarized in Bangla by KE Kabir)

সাপ্তাহিক সভায় ঋণ, সাশ্রয়, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এবং মাসিক বৈঠকে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক অবস্তার উপর আলোচনা করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবিকা ঃ প্রতি গ্রাম থেকে একজন করে স্বাস্থ্য সেবিকা নির্বাচন করা হয়। স্বাস্থ্য সেবিকাগণ গ্রামে ডাক্তার হিসাবে পরিচিত। এরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত। যক্ষা রোগ নির্ণয়ের জন্য কফের নমুন সংগ্রহ, চিকিৎসা করা, জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি বিতরণ ও কনডমের ব্যবহার নিশ্চিত করা ও সাধারণ অসুখ-বিসুখে পরামর্শ দেয়া, প্রভৃতি তাদের কাজ।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ কর্মসূচির আওতাধীন দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার মন্মথপুর ও রামপুর এলাকার উপরোক্ত গ্রুপগুলো থেকে বাছাই করা ১৫-৪৯ বছ বয়সী ৭৪ জন বিবাহিতা মহিলা উপর জরিপ চালানো হয়। এরা বেশির ভাগ মৌসুমী শ্রমিক ও নিরক্ষর। এদের মধ্যে মাত্র সাত জন স্বাস্থ্য সেবিকা ৮ম থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। এদের পরিবারের গড়পরতা জমির পরিমাণ ভিটেবাড়ি ছাড়া ৫০ শতাংশের কম।

গবেষনায় দেখা গেছে যে, প্রায় সবাই ্কই ধরনের প্রাত্যামিক কাজ করে থাকে। বেশির ভাগ মহিলারই ফজরের নামাজের পর থেকে কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় রাত ৯/১০ টায়। কাজের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছে – থালাবাস ও কাপড়-চোপড় ধোওয়া, উঠান ঝাড়ু দেয়া, সবজি বাগানের পরিচর্যা করা, ছেলে-মেয়েদের সাহায্য করা, হাঁস-মুরগী পালন করা, ধানভানা, খাদ্য তৈরি প্রভৃতি।

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহিলা সভার সদস্যদের ব্র্যাকের পক্ষ থেকে তেমন দায়িত্ব দেয়া হয় না। প্রতি তিন মাসে একদিন এক থেকে দেড় ঘন্টার বৈঠক হয়। এতে সাংসারিক কাজে তাদের তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। গ্রাম কমিটির সদস্যরা মহিলা সভা এবং গ্রাম সংগঠনেরও সদস্য। সাপ্তাহিক বৈঠকে প্রায় এক ঘন্টা এবং মাসিক বৈঠকে এক থেকে দু ঘন্টা সময় লাগে। যদিও গ্রাম সংগঠনের মহিলা সদস্যদের অনেক দায়িত্ব, কিন্তু তা কোনভাবে তাদের জন্য বোঝা নয়।

দেখা গেছে, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সেবিকাদেরকেই সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হয়। তাদেরকে মাসে একদিন স্থানীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এতে ৭-৮ ঘন্টা সময় লাগে। একদিন পর পর যক্ষা রোগীদের ইনজেকশন ও সপ্তাহে একদিন এন্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হয়। সম্ভাব্য যক্ষা রোগীর কফের নমুনা সংগ্রহ করে সংশিষ্ট অফিসে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হয়। এ ছাড়া শিশু পরিচর্যার উপর মাসে একদিন সাধারণ সভায় যোগ দিতে হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়িসহ কনডম বিতরণের দায়িত্ব স্বাস্থ্য সেবিকাদের পালন করতে হয়। আবার তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে গ্রাম সংগঠনের সভায়ও যোগ দিতে হয়। তাছাড়া সাধারণত: রোগ-ব্যাধিতেও পরামর্শ দিতে হয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রতিমাসে সাধারণ সভায় ৪-৫ ঘন্টা, গ্রাম কমিটির সভায় ১-৩ ঘন্টা এবং প্রতি তিন মাসে মহিলা সভায় প্রায় ৩ ঘন্টা ব্যয় করতে হয়। বেশির ভাগ স্বাস্থ্য সেবিকা ছোট ছোট গ্রাম সংগঠনের নেত্রীও। এসব সভায়ও মাসে ৮-১০ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। আবার ঋণ অনুমোদনের জন্যও ব্যাংকে তৎপরতা চালাত হয়।

তাদের প্রাত্যাহিক সাংসারিক কাজের ফাঁকেই ব্র্যাকের এসব কাজ করতে হয়। অনেক সময় ব্যস্ততার জন্য গৃহস্থালির সব কাজ করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া পরিবারের অন্যদের উপর এ বাড়তি কাজের চাপ পড়ে; বিশেষ করে স্কুলগামী কন্যা ও শাশুড়ীর উপর। অনেক সময় দিনের শেষে কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। মহিলাদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ করতে গিয়ে নিজের আয়ের পথই ব্যাহত হয়। হতাশার সৃষ্ঠি হয়। তাহলে তারা এসব কাজ কেন করছে? এর মুখ্য কারণ হলো তারা কাজ করছে এই আশায় যে, ব্র্যাক একদিন হয়তো তাদের জন্য কিছু করবে। তাদের হয়তো স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা হবে।

উপসংহারে বলা যায়, স্বাস্থ্য সেবিকারা মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে; কিন্তু আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে না বলে তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। বলতে গেলে এ কর্মসূচি স্বাস্থ্য সেবিকাদের উপর চাপের সৃষ্টি করেছে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ ছাড়া স্বাস্থ্য সেবিকা হিসাবে একান্নবর্তী পরিবারের ৩৫ বছর কিংবা তদুর্ধ বয়সী মহিলাদের নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ বয়সী মহিলাদের সাধারণতঃ ছোট ছেলে-মেয়ে না থাকায় ঝামেলা কম থাকে। এ ছাড়া একান্নবর্তী পরিবার হলে অন্যান্য সদস্যরা সাংসারিক কাজের দায়িত্ব কিছুটা লাঘব করতে পারে। সর্বোপরি, যেসব মহিলারা অন্য কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের স্বাস্থ্য সেবিকা হিসাবে নির্বাচন করলে তাদের কাজো বোঝা লাঘব হতো। যেহেতু ব্র্যাক-এর আয়মূলক কার্যক্রম থেকে এরা সুবিধা পেয়ে থাকে, শেষোক্তটা করলে তারা সে সুযোগ হারাতে পারে এবং পরিণামে সেবিকার কাজ ছেড়ে দিতে পারে, কারণ সেবিকার মাধ্যম যে আয় হয় তা যথেষ্ট নয়।

সরকারি কর্মী, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব[২৩]

আহমেদ আলী, শাহ নূর মাহমুদ, শামস মুস্তাফা ও ফজলুল করিম

১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশের ১৭ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ১০টি থানায় ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ভূমিহীন মা, শিশু, ও ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত মন উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন। মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাক একদিকে সরকারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিভিন্ন দিক যেমন, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির, ভিটামিন 'এ' এ্যাপসুল বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রভৃতিতে সহায়তা দিচ্ছে। অন্যদিকে শিশুদের দৈহিক ক্রমবৃদ্ধি, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অনেক মৌলিক সেবা কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে। স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও তিনটি থানায় মাতৃত্বজনিত মৃত্যু রোধ, নিউমোনিয়া ও খাদ্য সম্পূরণ কর্মসূচির পরিচালনা করা হয়েছে। (মাতৃত্বজনিত মৃত্যু রোধ ও নিউমোনিয়া দিনাজপুর ও বগুড়া সদর থানায় এবং খাদ্য সম্পূরণ কর্মসূচির মুক্তাগাছা থানায়।)।

সরকারি কার্যক্রমের সাথে পাশাাপশি কাজ করে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এর পাশাপশি জনগোষ্ঠী যাতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবধার সদ্ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ কর্মসূচির কর্মী ও ক্যাডরার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে। এই উদ্যোগ নিতে গিয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দাবিতে টিকাদান কেন্দ্র, প্রসব-পূর্ব সেবাদান কেন্দ্র এবং বন্ধ্যাকরণ ক্যাম্প প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসাধারণকে পরিচালিত করা হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত যোগাযোগ, সভা, প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদানের ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ধরনের মধ্যস্থতার ফলে মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি, সরকারি ব্যবস্থাপনা ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মাত্রা নিরূপণ করার সুযোগ আসে। এ সম্পর্কের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখারও সুযোগ আসে। সর্বোপরি স্বাস্থ্য সেবার সদ্ব্যবহার ও এর উপর সম্পর্কের প্রভাব কেমন তা জানারও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

ব্র্যাক, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের মাত্রা এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা বাস্ত বায়নের এর প্রভাব সম্পর্কে অনেক তথ্য ১৯৯৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পরিচালিত তুলনামূলক জরিপ থেকে জানা গেছে। এর জরিপে ৬৬২ জন সরকারি কর্মী ও ১১৩ জন ব্র্যাক কর্মীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডাকযোগে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ১৬৮ জন সেবা গ্রহীতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমেও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবার উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[23] Summary of the RED research report entitled "The impact of WHDP on the relation among GoB, community and BRAC' by Ahmed Ali et al., 1993 December, 54p (Summarized in Bangla by Sazzad Qadir)

গবেষণার ফলাফল

তুলনীয় এলাকাগুলোতে সরকারি কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রয়েছে পারস্পরিক আন্ত ঃক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু কর্মসূচির অধীন এলাকাগুলোতে এ সম্পর্ক বজায় রয়েছে সরকারি কর্মী, জনসাধারণ, ব্র্যাক কর্মী ও ব্র্যাক ক্যাডারদের ত্রিমুখী আন্তঃক্রিয়ার সূত্রে।

গ্রাম পর্যায়ের সেবা কেন্দ্রগুলোতে জনসাধারণ যায়, কিন্তু স্থায়ী কেন্দ্রগুলোতে যেতে চায় না। গ্রাম পর্যায়ের সেবা কেন্দ্রগুলোতে সেবা প্রদানকারীদের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে স্থায়ী কেন্দ্রগুলোর কর্মীদের চেয়ে ভাল।

সকল স্তরের সরকারি কর্মীদের বেশির ভাগ (৬৯%) বলেছেন, ব্রাকের কর্মসূচির প্রভাবে সেবা প্রদানের মান উন্নত হয়েছে। শতকরা ৪২ জন সরকারি কর্মী মনে করেন ব্র্যাকের কর্মসূচির প্রভাবে তাদের কাজের চাপ কমেছে, ৩৩% মনে করেন কাজের চাপ বেড়েছে।

সরকারি কর্মীদের ১২% বলেছেন ব্যাক কর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা একটি সমস্যা। কারণ, ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ঔষধপত্রের সরবরাহ অনিয়মিত ও অপ্রতুল। শতকরা ১০ জন বলেছেন যৌথ কাজে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। শতকরা পাঁচ জন বলেছেন ব্র্যাক কার্যক্রমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার মতো পরিবহণ সুবিধা তাদর নেই। শতকরা চার জন বলেছেন, ব্র্যাক কর্মীদের মধ্যে প্রত্যাশিত সক্রিয়তা নেই।

যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে ৬১% ব্র্যাক কর্মী অভিযোগ করেছেন, সরকারি কর্মীরা তেমন সক্রিয় নয়। শতকরা ১৯ জন বলেছেন, চাহিদার তুলনায় সরঞ্জাম ও ঔষধপত্রের সরবরাহ অনিয়মিত ও অপ্রতুল হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। শতকরা আট জন বলেছেন, এনজিওদের প্রতি সরকারি কর্মীদের নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গি রয়েছে। শতকরা ৭ জন বলেছেন, দু'পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সরকারি কর্মীদের পরিদর্শন বিমুখতা সম্পর্কেও বলেছেন ৭%।

সরকারি কর্মীরা বলেছেন, তাদের কর্মপরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করলে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। তারা মনে করেন, ব্র্যাকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের তাগিদ, সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে অতি প্রত্যাশা সৃষ্টি, সরবরাহের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি কর্মীদের কাজের চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে দু'পক্ষের সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে।

সরকারি কর্মীদের (সকর স্তরের) ৯৪% জানান, গত এক মাসে ব্র্যাক কর্মীদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে। ইপিআই কেন্দ্র ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক হচ্ছে এ দেখা সাক্ষাতের প্রধান স্থান।

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকার কাজ সম্পর্কে সরকারি কর্মীরা একাধিক উত্তর দিয়েছেন। এদের ৮২% জানেন যে তারা যক্ষ্মারোগী সনাক্ত করেন, ৪৮% জানেন তারা জন্মনিরোধক বিতরণ করেন, ৪৩% জানেন ইপিআই কেন্দ্রে সহায়তা করেন এবং ২১% জানেন যে, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণের সহযোগিতা করেন। সরকারি কর্মীদের ৭৮% মনে করেন যে, ব্র্যাকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা গর্ভবতী মহিলা সনাক্ত

করতে পারেন, ৬৪% মনে করেন যে, প্রসব-পূর্ব সেবা কেন্দ্রে তারা প্রসূতিকে নিয়ে আসেন, ৬৩% এর ধারণা তারা প্রসবে সহায়তা করেন এবং ২১% সরকারি কর্মী মনে করেন যে, ধাত্রীরা জন্মনিরোধকও বিতরণ করেন।

সরকারি কর্মীদের ৯৪% মনে করেন, ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকগণ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছেন। ৯১% বলেন, কর্মসূচি সংগঠক সবচেয়ে বেশি সহায়তা দেন ইপিআই কেন্দ্রগুলোতে, ৭০% বলেন স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলোতে। তবে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ ও জন্মনিরোধক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের কাজে তাঁদের সহায়তা আশানুরূপ নয় (৩০%)।

কন্ট্রোল এলাকাগুলোতে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, উভয়পক্ষর সম্পর্ক উন্নয়নে কেউ মধ্যস্থতা করে না। অথচ কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ব্র্যাক কর্মীরা সরকারি কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কর্মসূচিভুক্ত একটি এলাকার (গোবিন্দগঞ্জ) ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, তাদের গ্রাম কমিটি আয়োজিত সভায় সরকারি কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। তবে কন্ট্রোল এলাকায় এ ধরনের কোন কমিটি নেই।

কর্মসূচিভুক্ত এলাকার চেয়ে কন্ট্রোল এলাকায় অবস্থিত সরকারি কেন্দ্রগুলোতে রোগী বা তাদের অভিভাবকদের বেশির ভাগ আবারও সেবা নিতে রাজি আছেন। তবে স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলো তারা বেশি পছন্দ করেন। একইভাবে বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ব্র্যাকের অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মহিলাদের টিকাদান, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণ, নলকূপে পাকা প্লাটফর্ম, পিট ও স্ল্যাব পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার, হাতধোয়ায় ছাই বা সাবান ব্যবহার প্রভৃতির পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত উন্নত। শিশুদের টিকাদান ও বিভিন্ন কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একইরূপ।

উপসংহার

এ গবেষণা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্র্যাক কর্মীরা সরকারি কর্মী ও জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ পেয়েছেন। ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে চাহিদা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্র্যাক সফল হয়েছে। তাহলেও এক্ষেত্রে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ এ সচেতনতা থেকে কী ফলোদয় ঘটল তা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

সুপারিশ

গবেষণালব্ধ তথ্য মূল্যায়ন করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুপারিশ করা যায় ঃ

১) মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ পাঠানোর চাহিদা পূণের লক্ষ্য স্বাস্থ্য নীতি প্রণেতাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি ব্র্যাক বিবেচনা করতে পারে।

২) সরকারি কর্মীদের কর্মপরিকল্পনায় ব্র্যাক কর্মীদের সহায়তা বৃদ্ধি প্রয়োজন, যাতে অতিরিক্ত কাজের চাপ এড়ানো যায় এবং সেবা উন্নত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩) স্বাস্থ্য সবেতনতা, উদ্বুদ্ধকরণ ও ফলোদয়ের ক্ষেত্রে গ্রামভিত্তিক ক্যাডার, সরকারি ও ব্র্যাক কর্মীদের অধিকতর মিলিত উদ্যোগ দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের ব্যবহারে পরিবর্তন আনা যায়।

৪) উদ্বুদ্ধকরণ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়াতে ব্র্যাক কর্মী ও ক্যাডারদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

৫) ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সরকারি কর্মীদেরকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সহমর্মী করে তোলা যায়।

৬) ফাংশনাল রেফারাল সিস্টেমকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। থানা পর্যায়ের কর্মীদের সঙ্গে ব্র্যাক কর্মীদের কার্যকর যোগসূত্র ও নেটওয়ার্ক বজায় রাখতে হবে, যাতে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো স্থায়ী কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত সেবা নিশ্চিত করা যায়।

এক নজরে ব্র্যাক, ১৯৯৫

নিয়মিত মহিলা কর্মী	২,৮৮৬
নিয়মিত পুরুষ কর্মী	১৩,১৯৭

সর্বমোট নিয়মিত কর্মী	১৬,০৮৩

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই)

আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা	২২,১৬০
স্কুলের সংখ্যা	৩৫,১৭৫
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা	১১,৩৭,৭৬৭
শিক্ষকের সংখ্যা	৩৩,৫২৪

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিভাগ (এইচপিডি)

আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা	১২,০৫৬
আওতাধীন মোট জনসংখ্যা	১,৩৮,০০,০০০
মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন জনসংখ্যা	১৯,০০,০০০
ইপিআই সহায়তা কর্মসূচির আওতাধীন জনসংখ্যা	৯৪,০০,০০০
পরিবার পরিকল্পনা সহায়তা কর্মসূচির আওতাধীন জনসংখ্যা	৫৩,০০,০০০
প্রসব-পূর্ব পরিচর্যা কেন্দ্র	৮৯৮
স্বাস্থ্য সেবিকা	২৪,৩৭৩

পলী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি)

আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা	২৬,৯৪০
গ্রাম সংগঠন	৪৪,৬৫৬
সদস্য সংখ্যা	১৫,১০,০০০
সদস্যদের সঞ্চয়	৮০ কোটি টাকা
ঋণ বিতরণ	৯৫৮ কোটি টাকা
বকেয়া ঋণ	২২৯ কোটি টাকা
হাঁস-মুরগী পালনকারীর সংখ্যা	৮,৯৬,৪৬০
হাঁস-মুরগীর বাচ্চা পালনকারীর সংখ্যা	১২,৭০৪
হাঁস-মুরগীর খাদ্য বিক্রেতার সংখ্যা	২,৮০০
ডিম সংগ্রহকারীর সংখ্যা	৩,২৯৩

<u>গ্রামীণ ব্যবসা প্রকল্প</u>

রোঁস্তোরা	৮৬১
কাঠমিস্ত্রির কারখানা	২৯
মুদি দোকান	৩,৯৮০

<u>মৎস্য চাষ কার্যক্রম</u>

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৫৯,১০৭
মৎস চাষের আওতাধীন জমি (একর)	১৩,৪৪৩

<u>সব্জি চাষ কার্যক্রম</u>

উৎপাদনকারী সংখ্যা	৩৯,৭৬৭
চাষকৃত জমির পরিমাণ (একর)	১৩,৬০৭